১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী
মহারাজের একান্ত - ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনা সংকলন

অভিনব দর্শন প্রকাশন
প্রকাশন বিভাগ

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
চপল মিত্র

শ্রুতিলেখিকা ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় এবং হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
(শুভ উপনয়ন দিবস উপলক্ষ্যে)

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

মুখবন্ধ

ঘুম বা নিদ্রা প্রকৃতির এক মহাদান। ঘুমের উদ্দেশ্য কি শুধুই বিশ্রাম, আরাম আর অলীক স্বপ্ন দেখা? সংসারের দুঃখ কষ্টের হাত থেকে সাময়িক মুক্তির জন্যই কি প্রকৃতির নিয়মে ঘুমের ব্যবস্থা? তবে কি ঘুম (দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য) এক জাতীয় মৃত্যু? না, মৃত্যুর পূর্বাভাষ? প্রকৃতি আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে, ঘুম সুখের জন্য দেওয়া হয়নি। ঘুমটা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সুরকে জানার জন্য, প্রকৃতির তত্ত্বকে জানার জন্য। তবে কি ঘুম পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে আরাম করার জন্য নয়? ঘুম কি একজাতীয় সমাধি? হাজার হাজার দিনের ঘুম একত্র করলেই চিরনিদ্রা হয়ে যায়। তবে চিরনিদ্রাকেই কি চিরনিদ্রিত সমাধি বলে?

ঘুমালেই কি স্বপ্ন অনিবার্য? স্বপ্ন অর্থাৎ সমাধি হলেই কি দর্শন হবে? আত্মার যে অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণ কি স্বপ্ন? স্বপ্নের ঘটনাগুলির কি বাস্তবে কোন মূল্য দেওয়া যায়? স্বপ্ন যখন বাস্তব হয় অর্থাৎ স্বপ্নের যে speed টা, তা যদি বাস্তবে আনতে পারা যায়, তবে কি success অনিবার্য? স্বপ্নের অস্তিত্ব যদি সঠিক হয়, তবে কি স্বপ্নের ঘটনার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়? বাস্তবে sense টা আছে বলে কোন অন্যায় করলে spot পড়ে যায়। তেমনি স্বপ্নে যদি sense টা থাকে, তবে স্বপ্নে অন্যায় করলে, অপরাধ করলে, সেটা কি অপরাধ বলে গণ্য হবে? বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি?

জীব কি সর্ব অবস্থায় সমাধিতে থাকে? যে যেভাবে আছে, যে অবস্থায় আছে, সেটাও কি সমাধি? সমাধি যদি প্রকৃতির সহজাত নিয়ম হয়, তবে স্বপ্ন কি তার মাত্রা? স্বপ্নাবস্থায় সেই মুহূর্ত্তে কি মনে কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থাকে না? মুহূর্ত্তের চিন্তার সাথে সাথে কাজ হয়ে যায়, এটা কি স্বপ্নে সম্ভব? ঘুমটা যদি একজাতীয় মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুটা কি একজাতীয় সমাধি?

১৬ মাত্রায় নিদ্রা সমাধি হলে, একবার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কি আবার ইচ্ছামত দেহে প্রবেশ করা যায়? যদি না যায়, তবে কি এই সমাধি চিরনিদ্রিত নির্বিকল্প সমাধি? চিরনিদ্রিত নির্বিকল্প অর্থাৎ বিলীন হয়ে যাওয়ার সমাধি? আবার ১৬ মাত্রায় ধ্যান সমাধি হলে, একবার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে সমস্ত কাজকর্ম (যে উদ্দেশ্যে ধ্যান সমাধি হওয়া) সেরে আবার দেহে প্রবেশ করে পুনর্জীবন লাভ করা যায় কি? যদি যায়, তবে এটাও কি নির্বিকল্প সমাধি?

ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধিতে কি সব সাধু, যোগী, ঋষিরা আসীন হতে পারেন? শুধু যোগ সাধনা করলেই কি নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হওয়া যায়? না, জন্মগত কিছু থাকলে তবেই নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হওয়া যায়? নির্বিকল্প সমাধির প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা কি সকল সাধু, যোগী, ঋষি, শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব? না, যিনি সর্ব অবস্থায় পূর্ণ হয়ে আসেন, অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধি যাঁর জন্মগত, এই ধরাধামে এসে নতুন করে যাঁকে সাধনভজন কিছু করতে হয় না, যিনি জাগ্রত সমাধি বা ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হয়ে দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে সকল কাজ সম্পন্ন করে, আবার ফিরে এসে নিজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করে পুনর্জীবন লাভ করতে পারেন, নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব নয় কি? এই সকল বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানকল্পে চলুন আমরা যাই উত্তর কোলকাতার শ্যামবাজার '৪৬ নং ভূপেন বোস এভিনিউ'র বাড়ীতে, যেখানে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক মহারাজ ১৯৬০ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ব্যাপী দিবারাত্র প্রকাশ্য জনসমক্ষে জাগ্রত ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হয়েছিলেন। সেই দিনগুলির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ আমরা জেনে নিই উপস্থিত পন্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক, চিকিৎসক, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং সমাধি অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূল্য আর্শীবাণী থেকে।

এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে বহু মূল্যবান বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বেদতত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে। এই সকল (অপ্রকাশিত) বেদতত্ত্ব পাণ্ডুলিপি, শ্রুতিলিখন ও ক্যাসেটবন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করে মুদ্রণাকারে লিপিবদ্ধ করে (শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত) ছোট ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের গুরু দায়িত্ব বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের উপর তিনি অর্পন করেছেন এবং একটি প্রকাশন বিভাগ গঠন করে, তার নাম দিয়েছেন **"অভিনব দর্শন"**। অভিনব দর্শন প্রকাশনের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাদ স্বরূপ তিনি তাঁর বাহনটি আমাদের অর্পণ করেছেন। তাঁর দেওয়া বাহন ও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথায় নিয়েপঞ্চম শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হল, **১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি**।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যারা সর্বপ্রকার সহয়োগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী চম্পক মিত্র, শ্রীমতি নিহার দাস, এদের সকলকে জানাই আন্তরিক বৈদিক সম্ভাষণ **রাম নারায়ণ রাম**।

পরিশেষে এই বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে যে সমস্ত ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সঙ্গে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন ও করছেন তাদের সকলকে জানাই বৈদিক অভিনন্দন **'রাম নারায়ণ রাম'**।

১০ই আষাঢ়, ১৪১২ *চপল মিত্র*
২৫শে জুন, ২০০৫ *(প্রকাশক)*

-ঃ ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি ঃ-
বিশেষ দ্রষ্টব্য

- পরম পিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রুতিলিখনে এবং টেপ-রেকর্ড থেকে সংকলনে, তিনি যখন যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, হুবহু সেটাই রেখে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনও কখনও তিনি একই বাক্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠিক সেইভাবেই তাঁর বাণী জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোল।

- সুখচরধামে অনেক আবাসিক থাকতেন। বাইরে থেকেও অনেকে নিয়মিত আসা যাওয়া করতেন। ঘরোয়া আলাপের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝানোর সুবিধার জন্য অনেকের নাম ধরে ধরে বলতেন। প্রয়োজনের স্বার্থে নামগুলি উল্লেখ না করে 'ক' 'খ' ইত্যাদিরূপে বলা হয়েছে।

- পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পুনরুক্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে শ্রীশ্রী ঠাকুর তত্ত্বের গভীরতা মনে গেঁথে দেবার জন্য পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মা অসীম ধৈর্যসহকারে তাঁর সন্তানকে কোন কিছু শেখানোর জন্য বারবার করে সেই কথাটি সন্তানের কাছে বলতে থাকেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি তার মনে গেঁথে না যায়, মায়ের চেষ্টার অন্ত থাকে না। সন্তান শিখে নিলে মায়ের মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তির হাসি। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের কাছে। প্রকৃতির গভীর তত্ত্বের খনি থেকে মণি আহরণ করে একটি একটি করে তুলে ধরছেন আমাদের সামনে। অনাদি অনন্ত প্রকৃতি মায়ের কাছে আমরা সবাই নিতান্তই অবোধ শিশু। প্রকৃতির এই তত্ত্বের ব্যাপকতা সুদূরপ্রসারী। আমাদের মনে তত্ত্বের সুর, তত্ত্বের গভীরতা, এই অনন্ত জ্ঞানরাশি একটু একটু করে গেঁথে দেবার জন্য পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর একই কথা বারবার করে বলেছেন। একই বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি করেছেন।

স্বপ্ন সমাধি মৃত্যু আত্মা

(২১-০৫-১৯৮৪)

প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ যদি suicide (আত্মহত্যা) ক'রে, নিজের ইচ্ছাতে বিদেহী হয়ে যায়, তবে জানা মৃত্যু দিয়ে আবার যে জ্বালার মধ্যে পড়ে গেল, সেতো জানে না। এইজন্যই এখানকার (এই পৃথিবীর) সাময়িক দুঃখটাকে বড় মনে করে। এটাই ওকে (শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভক্ত - ছ) বারণ করেছিলাম, করবি না, করবি না, করবি না।

সেদিন অনিলের (শ্রীশ্রীঠাকুরের এক শিষ্য) বউটা গলায় ফাঁস লটকাইছে। ছোট বাচ্চাটা দেখতে পাইছে। দেখতে পাইয়া তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া আইসা ফাঁসটা কাইটা (কেটে) দিছে। বাঁইচা (বেঁচে) গেছে। ব্যাপারটা moment-এ (মুহূর্ত্তে) হয়ে গেল।

এখন অনিল আমার কাছে এসে বলছে, 'বাবা, আমি এখন কি করবো?'

ঐ বৌকে তো সে গ্রহণ করতে পারে না। বিদেহীর আত্মার কামনায় সে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই আত্মাটায় অর্থাৎ অনিলের বৌয়ের আত্মাটায় এখন বিদেহীর প্রভাবটা হয়ে গেল। বিদেহীর আত্মার চিন্তায় সে (অনিলের বৌ) কাজটা করেছে। ফাঁসটা লটকাইছে। দেখতে পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটা কাইটা দিছে, moment-এ বাঁইচা গেছে। ধপ্ কইরা পইড়া গেছে। কিন্তু অর মধ্যে বিদেহী আত্মার ছাপটা আইয়া পড়ছে। এখন বাপের বাড়ী চইলা গেছে।

অনিল যে, ওর (বৌয়ের) সঙ্গে শুইবো, থাকবো, অর লগে কথা কইব, কেম্‌নে কইব? বিদেহীর ছাপটা প্রতিমুহূর্ত্তে অর মধ্যে ঢুইকা পড়ছে। ফাঁস দেওনের লগে লগে at the moment-এ বিদেহীর প্রভাবটা যদি হইয়া যায়, তাহলে বাঁইচা থাকাকালীন বিদেহীর প্রভাবটাই তো থাকবো। আমি অনিলরে কইলাম, 'কি আর করবি, সংসারে থাক।'

ফাঁস দেওনের লগে লগে at the moment-এ বিদেহীর প্রভাবটা যদি হইয়া যায়, তাহলে বাঁইচা থাকাকালীন বিদেহীর প্রভাবটাই তো থাকবো।

এর লইগাই (জন্যই) কইছে, মৃত্যু কামনাও করা উচিত নয়। তুমি যখন জানো মৃত্যু আছে, মৃত্যু কামনা কইরা (করে) লাভটা কি? তোমার চারপাশ দেখে, পারিপার্শ্বিক দেখে তুমি তো জেনে গেছ, তোমার মৃত্যু আছে। এটা তো genuine (জেনুইন) কথাটা বুঝলে? মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং মৃত্যু কামনা করতে পারবে না। এমনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়ে যাবে।

অনেকে অনেকসময় বলে, 'আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, মরে গেলে বাঁচি।' এইগুলি কেমন কথা জানোস্? যেমন মাছের মাথাটা রইছে। পরিবেশনের সময় জিজ্ঞাসা করতাছে, 'মাথাটা কার।'

আরেকজন কইল, 'গুপীর (সুখচর ধামের একজন আবাসিক ছিলেন) মাথা।' 'গুপীর জন্য রাখা মাথাটা', হইল 'গুপীর মাথা।'

'দূর ভালো লাগে না, বাঁচতে ইচ্ছা করে না,' এইগুলি হইল এই ধরণের কথা। এতে তো মৃত্যু কামনা হচ্ছে না। এই ধরণের কথা হইল, দুঃখের একটা অভিব্যক্তি বা প্রকাশমাত্র; প্রকাশ ভঙ্গিমার একটা রূপ।

নেচারের (nature-র) এমন law, এমন আইন যে, কোথায় কোনটা অপরাধ হয়ে যাবে, ঠিক নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে অপরাধ হয়ে যায়। এমনি অপরাধ হবেনা, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়। তখন আইট্‌কা (আটকে) পড়তে হয়.। এইগুলি মেনে আইন বাঁচিয়ে সবসময় চলা কি সম্ভব?

-- আবার জানতেও তো হবে।

-- এইজন্যই জেনে নিতে হয়। যিনি সবসময় এই পথে থাকেন, এই পথে চলেন, এই পথের চর্চা করেন, তাঁর থেকে কিছু কিছু জেনে নিতে হয়।

এই যে 'ছ' এখন আইট্কা গেল গিয়া, কি অবস্থার মধ্যে পইড়া (পড়ে) গেল। 'ও' (ছ) এখন সব বুঝতে পারতাছে। এর লইগাই (জন্যই) বিদেহীরে বলে অপদেবতা। দেবতার একটা নাম খোঁজ আছে তো। সুতরাং অপদেবতা, বুঝতে পারতেছ না? দেবতার অনেক অংশ ওর (বিদেহীর) মধ্যে আছে। তাহলে দেখা যায়, অর মধ্যে অর্থাৎ বিদেহী বা অপদেবতার মধ্যে যদি দেবতার অংশ থাকে, তবে দেহীর মধ্যে আরও বেশী দেবতার অংশ থাকবে।

নেচারের (nature-র) এমন law, এমন আইন যে, কোথায় কোনটা অপরাধ হয়ে যাবে, ঠিক নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে অপরাধ হয়ে যায়। এমনি অপরাধ হবেনা, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়। তখন আইট্কা আটকে পড়তে হয়.। এইগুলি মেনে আইন বাঁচিয়ে সবসময় চলা কি সম্ভব?

দেহীর মধ্যে দেবতার যে অংশটা আছে, সেটা যন্ত্রপাতির মধ্যে রক্ত মাংসের মধ্যে সবটা জড়ানো অবস্থায় রয়েছে। তারজন্য এটা প্রকাশ পাইতে সময় লাগছে। যেমন বীজ থেকে ফল পর্যন্ত পাইতে অনেক ঝামেলা, অনেক সময় লাগে। আবার কলমের গাছে একবছরেই ফল ধরতে দেখা যায়। কারণ গাছটা পাকা। পাকা গাছের থিকা (থেকে) আনছে বইলাই (বলেই) পাকাই রইয়া গেছে। তুমি দেখতাছ (দেখছো), কলমের গাছে পাকা আমটা ঝুলতাছে। বীজ থিকা তো হয় নাই। বীজ থিকা এমুন গাছ তো হইতে পারে না। অর (বীজের) সময়, অবস্থা, ব্যবস্থা সব সময়ে অর্থাৎ যথাসময়ে হবে। তারপরে তো গাছ। তারপরে ফল। সেতো অনেক সময়ের ব্যাপার।

দেহীর মধ্যে দেবতার যে অংশটা আছে, সেটা যন্ত্রপাতির মধ্যে রক্ত মাংসের মধ্যে সবটা জড়ানো অবস্থায় রয়েছে। তারজন্য এটা প্রকাশ পাইতে সময় লাগছে।

যে মুহূর্ত্তে দেহ থেকে sense-টা (সেন্সটা) বেরিয়ে গিয়ে বিদেহী হইয়া যায়, তখনই পাকা হইয়া যায়। কি রকম পাকা হয়? দেহের মধ্যে যন্ত্রপাতির মধ্যে যেগুলি আট্কা (আবদ্ধ) ছিল, দেহ থিকা যেই বাইরাইয়া গেল, একেবারে পাকা বুঝ হইয়া গেল। বুঝটা পাকা হইয়া গেল। Sense-টা ফুইটা গিয়া তখন সব বুঝতে পারতেছে, 'আগে তো বুঝি নাই। এখন বুঝতাছি (বুঝছি)। অসুবিধায় পইরা গেছি। ঠাকুরতো কত কথা বলছেন। তখন তো মূল্য দিই নাই। তখন বুঝি নাই। আরে সর্বনাশ। কি ফ্যাসাদে পড়ছি। এইবার যদি জন্ম হয়, ঠাকুরের কাছে যদি যাইতে পারি কোনমতে, আর ভুল করুম না।' ঠাকুর ঠাকুর চিৎকার আরম্ভ কইরা দিছে। কিন্তু শব্দ নাই। বাইরাইয়া (বেরিয়ে) গেছে তো। আওয়াজের যন্ত্রটাই তো নাই। ঠাকুর ঠাকুর করতে করতে হাতটা এমুন কইরা বাড়াইতে (বাড়াতে) গেছে হাতটা ২০০ হাত লম্বা হইয়া গেছে। Balance (ব্যালান্স) নাই। কোনটাই কিছু ঠিক নাই। হাত, পা এমুন এমুন করতাছে (করছে)। কিছুই করতে পারতাছে না।

একটা shadow (ছায়া) মতন থাকে। ছায়ার মত, ঐ ছায়াটা নিয়েই থাকে। মানুষের থিকা যেমুন ছায়াটারে বড় দেখা যায়। দৈত্যের মত ছায়াটাই থাকে সবসময়। ছায়াটা হইল ইঙ্গিত। ঐ ছায়াটা, ছায়াটার মতনই একটা কিছু বাইরাইয়া যায়। বাইরাইয়া গেলে হয় কি, এটার সঙ্গে ছোট্ট একটা কণার মত থাইকা (থেকে) যায় যেমুন, স্বপ্নে ঐটা লুকাইয়া থাকে। ঐটাই খালি প্রকাশ পাইতে থাকে। এই যে বাইরাইয়া গেল -- সঞ্চয়, এতদিনকার, এতদিন আগেকার সবটা সঞ্চয় নিয়া একেবারে সে বাইরাইয়া গেল। বেরিয়ে গিয়া তখন বুঝতে শুরু করে। এই বুঝটা কিরকম?

বিদেহী আর দেহীর সঙ্গে যুক্তটা কিরকম? দেহীর থিকা যে বিদেহী হয়, যেটা আছে, সেটাই হয়, এইটাই মনে রাখবা। এইটাই সর্ব অবস্থায় sense-টা (সেন্সটা) খেলতে থাকে। যেটা নাই, সেটা কখনও হবে না। যেমন, তুমি খাটে ঘুমিয়ে আছ, নাক ডাকছো। দেখা গেল, তুমি বাবার কাছে

আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা কেউ এটা বাইর করতে পারে নাই। আত্মা যে আছে, আত্মার যে অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণটা হইল dream (স্বপ্ন), আত্মার যে প্রভাবটা সেইটা হইল dream (স্বপ্ন)।

গেছ গিয়া। সেখানে গিয়া দৌড়াদৌড়ি করছো, গাছের আম খাবার ব্যবস্থা করছো। ঘুরাঘুরি করছো, এদিকে যাও, সেদিকে যাও, ওদিকে যাও। নৌকা কইরা গেলা, বেড়াইলা। মরাটার মত কিন্তু শুইয়া আছ খাটের উপরে। তারপরে যখন জাগলা, কথাগুলি মনে পড়লো। এই যে মনে পড়লো, বিদেহীর অবস্থাটা যদি না থাকতো, তাইলে মনে পড়তো না। এইটা হইল experimental truth (পরীক্ষিত সত্য)। এইটা হইল আত্মা যে আছে, তার প্রমাণ। আজ পর্যন্ত দার্শনিকরা কেউ এটা বাইর করতে পারে নাই। আত্মা যে আছে, আত্মার যে অস্তিত্ব আছে, তার প্রমাণটা হইল dream (স্বপ্ন), আত্মার যে প্রভাবটা সেইটা হইল dream (স্বপ্ন)। Dream-এর অস্তিত্ব সঠিক, কিন্তু dream -এর (স্বপ্নের) ঘটনার উপরে আস্থা স্থাপন করা উচিত না। Dream-এর (স্বপ্নের) ঘটনার উপরে নির্ভর করবে না। কিন্তু ঘটনা যে ঘটে যাচ্ছে, যদি কিছু না থাকতো, ঘটনা ঘটতে পারতো না। এতবড় ঘুমের মধ্যে নাক ডাকছো। ঘুম থেকে উঠে মনে পড়লো, 'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা কইলাম। বাবা, তুমি যে ওখানে গেছ, কেমুন লাগে বাবা? ভালো লাগছে?' বাবা বললো, 'নারে, বড়ো দুঃখে আছি। তোমাদের কথা মনে পড়ে।' আরও অনেক কথাবার্তা বলেছো। প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে জাইগা উইঠা (জেগে উঠে) মাকে বললা, 'মা, মা বাথরুমে যামু।' মা উঠে বললো, 'আইচ্ছা, চল চল চল।' এবার বাথরুম থিকা আইসা (থেকে এসে) মাকে বলতাছ, জানো মা, বাবার লগে (সঙ্গে) কথা কইলাম। এই এই বলছি, এই এই বলছি, মাকে সব কথাগুলি বলতাছ। স্বপ্নে দেখ বলে বলছি না, এইটা কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়। তুমি ঘুমিয়ে আছ। আবার তুমিই আরেক জায়গায় গিয়া বাবার সঙ্গে কথা বলছো। এই যে যাইয়া গিয়া কথা বলা, এইটাই যদি তোমাকে death (ডেথ) কইরা রাইখা (রেখে) দেওয়া হয়, তাইলে কিন্তু তুমি কথা বলতে বলতে গেলে। এইটাই চলে যায়। তুমি মৃতবৎ থেকে তুমি যে আরেকজনের সাথে কথা বলছো, স্বপ্নের অস্তিত্বের প্রভাবটা যদি না থাকতো, আগে কি ঘটনা ঘটে গেছে স্বপ্নে, সেটা বলতে পারতে না। অদ্ভুত কথা। বলাটা কিন্তু সাংঘাতিক কথা। শুয়ে আছ তুমি। নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছ। ঘটনা ঘটে গেছে। চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে এলে। জেগে উঠে সব কথা পরিষ্কার বলতে আরম্ভ করেছ।

-- জানিস্ ভাই, বাবা এসেছিল, জল খেতে দিলাম। জল খেয়ে বাবা খুব তৃপ্তি পেয়ে গেছে। বললো, 'আমি আবার এসে তোদের সঙ্গে দেখা করুম। খুব ভাল লাগলো।' স্বপ্নে কিন্তু। এদিকে তুমি মরাটার মত নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছ।

ঘুমটা হইল একজাতীয় মৃত্যু। মৃত্যুর সমতুল্য ঘুমটা, মনে রেখো। এই ঘুমাতে ঘুমাতে, ঘুমাতে ঘুমাতে একদিন এমন একটা ঘুম আসবে, সেদিন যদি সারাবছরের ঘুমটা একত্র হয়ে যায়, একদিনে গিয়া যদি সারাবছরের ঘুমটা একত্র হয়, সে তো মারা যাবেই। যেমন একসঙ্গে বেশী ঘুমের পিল খেলে মারা যায়। বেশী ঘুম হইয়া যাইতাছে, উঠতে পারে না। ঐদিন যেদিন মৃত্যু হয়, সেদিন যদি মনে কর, ৩০ বছরের ঘুমটা একদিনে জমা হয়ে যায়, সে কি বাঁচতে পারে? কথা বুঝলা? ত্রিশ বছরের ঘুমটা একদিনে জমা হইলে কি অবস্থা, মনে কর। ৫ দিনের ঘুমটা যদি ১ দিনে ঘুমায়, বেশী ঘুম হইব না? একমাত্রা, দুইমাত্রা, তিনমাত্রা, চারমাত্রা, পাঁচদিনে পাঁচমাত্রা। একদিনের একমাত্রায়ই কত ঘুমায়। দুইমাত্রায় আরেকটু বেশী ঘুমাবে। তিনমাত্রায় আরেকটু বেশী ঘুমাবে। চার মাত্রায় আরেকটু বেশী ঘুমাবে। পাঁচমাত্রায় আরেকটু বেশী ঘুমাবে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে ১৬ মাত্রায় ঘুম যদি একদিনে দিয়ে দেওয়া যায়, এমন বেশী ঘুম হইয়া যাইব যে, আর উঠতে পারবে না। মৃত্যুটা যে আছে, তোমরা জানতে পারবে, ঘুমিয়ে থেকে। আত্মাটা যে আছে, তোমরা বুঝতে পারবে প্রতিদিনের স্বপ্নের মাধ্যমে।

ঘুমটা হইল একজাতীয় মৃত্যু। মৃত্যুর সমতুল্য ঘুমটা, মনে রেখো।

৫ দিনের ঘুমটা যদি ১ দিনে ঘুমায়, বেশী ঘুম হইব না?

মৃত্যুটাই হচ্ছে চরম ঘুম, যেই ঘুম থেকে আর জাগতে পারে না। এই হইল মৃত্যুর definition (সংজ্ঞা)। Definition-টা কি? প্রতিদিনের সাধারণ যে ঘুম মৃত্যুর একটা কণা ইঙ্গিত। প্রতিদিন আমরা মৃত্যুর সাথে

মৃত্যুটা যে আছে, তোমরা জানতে পারবে, ঘুমিয়ে থেকে। আত্মাটা যে আছে, তোমরা বুঝতে পারবে প্রতিদিনের স্বপ্নের মাধ্যমে।

হাত মিলাই, প্রতিদিন। এই যে ঘুমিয়ে থাক না, আরাম লাগতেছে (লাগছে), ভাল লাগতেছে; বলো না। প্রতিদিন মৃত্যুকে আহ্বান করছো প্রকারান্তরে। 'চল যাই, একটু মইরা (মরে) আসি,' এই কথা তো কেউ বলে না। 'চল যাই, একটু মইরা আসি গিয়া, একটু মরার ঘরে গিয়া বসি', এই কথা বললে যেমন শোনায়, এও তো তাই। মরার ঘরেই তো যাইতাছ। বিছানা করতাছ। মরার সময় যা হয়, যেমন হয়। বিছানাটা কইরা শুইয়া পড়লা। আয় ঘুম আয়। মৃত্যুকে কামনা করছো। আস্তে আস্তে কখন যে মরে গেলা বুঝতেও পারলা না। মরে কিন্তু গেলা, এটা হলো মৃত্যুর কামনায় দৈনন্দিন মৃত্যু। এইরকম ৩৬৫ দিন প্রতিদিন তোমাকে এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে হাত মিলাতে হচ্ছে।

Nature (প্রকৃতি) কিন্তু বলে দিচ্ছে, আজ আট ঘন্টা মৃত্যুর সঙ্গে যোগাযোগ করলা। আজ কিন্তু ছয় ঘন্টা করলা। আজ সারাদিনে এগার ঘন্টা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলে। এইভাবে ১ বছর গেল, ২ বছর গেল। ক্রমে ক্রমে ৫০ বছর, ৬০ বছর, ৭০ বছর চলে গেল। পথিক, আর কত ঘুমাবে? আর কত মৃত্যুর সাথে হাত মিলাবে? এবার সম্বল বাঁধ। তোমরা বুঝতে পার না? নিজে যখন ঘুমিয়ে থাক, তখন যে আরেক জায়গায় যাও, এদিক ওদিক যে ঘুরে বেড়াও, তোমরা বুঝতে পার না? তুমি থাক এখানে, চলে যাও সেথায়। তারপরের কথাটাতো গল্প নয়। তোমরা যাও বলে তো এমনি বুঝতে পারবে না। এমনি বিশ্বাসও করবে না। তোমরা ঘুমিয়ে কিন্তু থাক না, এই কথা যদি বলা হয়, তোমাদের মনঃপূত হবে না, তোমরা বিশ্বাসও করতে পারবে না। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করতে হবে এইজন্য যে, মৃত্যুর অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকাকালীন তোমরা যে যাও, জেগে উঠে তখন সেই কথাটা মনে পড়ে কি না।

-- হ্যাঁ মনে পড়ে।

-- তাহলে তোমার কি বোঝা উচিত?

তাহলে তো দুজন হয়ে গেল। মৃত্যু - চলে গেল। সে চলে গিয়া যে কাহিনীগুলো সংগ্রহ করে নিয়া আসলো, যখন ঢুকলো, যখন জাগলো, সে কিন্তু বলতে শুরু করলো। বুঝতে পারছো, কি বললাম? বুঝতে পেরেছ? যখন ঘুমিয়ে পড়লে, ঘুমের মধ্যে তারপর যে ঘুরলে, ফিরলে, বেড়ালে, এদিক ওদিক গেলে, কথাবার্তা বললে, আলোচনা করলে, স্বপ্নে যেটা দেখ, সেটা যদি জেগে তোমার মনে না থাকতো বা জেগে যদি বিস্মরণ হতো, তবে ঐ স্বপ্নের বা স্বপ্ন দেখার কোন মূল্য হতো না।

মূল্য হলো কোথায়? যে ঘটনা তুমি চরম ঘুমের মধ্যে দেখছো, জেগে উঠে সেটার স্মরণ করতে পারছো। ঘুমটাকে বলছে, সমাধি। এটা হল একজাতীয় সমাধি। আর মৃত্যুটা হচ্ছে চিরনিদ্রিত সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প অর্থাৎ বিলীন হয়ে গেছে। নির্বিকল্প সমাধি হলে সেই স্থান থেকে আর উঠে আসতে পারে না। ঘুমের চরম একটা মাত্রা আছে, সেই মাত্রায় গিয়ে যদি পৌঁছে, সেখান থেকে উঠে আসা যায় না। জলের এমন একটা স্তর আছে, সেখানে চলে গেলে উপরে আর উঠতে পারে না। সমুদ্রের একটা স্তর আছে, ঐ পর্যন্ত চলে গেলে, আর এদিকে ফিরে আসতে পারে না। ঘুমেরও একটা স্তর আছে, ঔষধ খেয়েই ঘুমাও আর যেভাবেই ঘুমাও, অমুক একটা স্তরে পৌঁছলে, সেখান থেকে আর উঠে আসতে পারে না। সুতরাং উঠে আসতে যখন আর পারে না, বিলীন, লীন হয়ে যায়।

আর মৃত্যুটা হচ্ছে চিরনিদ্রিত সমাধি, নিবিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প অর্থাৎ বিলীন হয়ে গেছে।

এখন যে স্তরে তোমরা থাক, ডুব দিয়ে যেমন ওঠো। কারণ উঠে আসার স্তরটা থাকে। এই ঘুমে উঠে আসার স্তরটা থাকে। আবার দেখা গেছে, কেউ ঘুমিয়ে আছে, গভীর ঘুম। স্বপ্ন দেখতাছে, সে গেছে আরেক জায়গায়। হঠাৎ করছে কি, বনের মধ্যে এক সাপ দেখতে পাইছে। সাপে ওকে ছোবল দিচ্ছে। ছোবল দেওয়া মাত্রই - 'হা শেষ হয়ে গেলাম।' সে দেখতাছে, সে ওখানে মারা গেছে।

সাপের ছোবলে ওখানে মারা গেল। ও মরে যাওয়াতে এখানে আর উঠতে পারতেছে (পারছে) না। তাইলেই বুঝতে পারছো, 'ও' কিন্তু বাস্তবে ছোবল খেল না। স্বপ্নে ছোবল খাইল গিয়া এক জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে চিত হইয়া পড়ে আছে। 'হা চলে গেলাম'। সত্যসত্যই চলে গেল।

এখানে কিন্তু ঘুমাইতেছে। সাপের ছোবলে ওখানে মারা গেল। ও মরে যাওয়াতে এখানে আর উঠতে পারতেছে (পারছে) না। তাইলেই বুঝতে পারছো, 'ও' কিন্তু বাস্তবে ছোবল খেল না। স্বপ্নে ছোবল খাইল গিয়া এক জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে চিত হইয়া পড়ে আছে। 'হা চলে গেলাম'। সত্যসত্যই চলে গেল। বুঝছো তো? Heart fail হইয়া গেল। ঐখানের মৃত্যুটা ঘটলো এখানে। কারণ আত্মাটা same (এক), আত্মাটা স্রেফ 'ওর'। কথাটা বুঝতে পারছো? চলে গেল কিন্তু সে। ছোবলও খেল না, কিছুই না। ঘরে মধ্যে লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া রইছে। মারা গেল। বুঝতো তো?

আবার আরেকজন বাঁচলো। স্বপ্ন দেখতাছে, সাপে তাড়া করতাছে (করছে), 'ও' দৌড়াইতেছে। ঐ ধাক্কায় আবার জাইগা (জেগে) গেছে গিয়া। সাপ সাপ করতাছে আত্মায়। জাইগা উইঠা কইতাছে পাশের জনরে (পাশের জনকে), বাতিটা জ্বালাতো। উঃ উঃ হাঁপাইতেছে। দেখতো, মেঝেতে সাপটাপ আছে নাকি? বাতিটা জ্বালা। বাতিটা জ্বালা।

-- সাপ আইছে নাকি আবার?

-- না, দেখ না। ভাল করে দেখ না।

-- না, না। কোন সাপটাপ নেই। ভাল করে দেখেছি। সব জায়াগায় দেখেছি।

-- দেখ না, স্পপ্ন যা দেখছি না, আমারে সাপ এমন তাড়া করছে, আমি ছুট।

আবার আরেকজন জলে পড়েছে স্বপ্নে। এদিকে ঘুমাইতেছে কিন্তু গায়ে লেপ মুড়ি দিয়া। স্বপ্নে সাঁতার জানে না। জল খাইতাছে। জল খাইয়া জল খাইয়া চিত হইয়া রইছে। সকালে উইঠা (উঠে) দেখে, পেট ফুলে রইছে। আরেকজন কিছুর মধ্যে কিছু না, ভালমানুষ খাইয়া শুইছে। স্বপ্নে মিষ্টি খাইছে (খেয়েছে)। রসগোল্লা, সন্দেশ, দই টই, পোলাও টোলাও অনেক কিছু খাইছে। খাইয়া পেঠ ফুলাইয়া (ফুলিয়ে) দিছে। সকালবেলা উইঠা চোঁয়া ঢেকুর দিতাছে। পেট ফাঁইপা (ফেঁপে) গেছে।

প্রত্যেকটি জিনিস চিন্তা কইরা দেখবা যখন সেই জিনিসের চিন্তা কইরা (করে) যে জিনিস বের হয়, সেই জিনিস না থাকলে এই জিনিস বের হয় না, হতে পারে না। এটা একটা point মনে রেখো। যে জিনিস আছে, সত্যের আকুলতা আছে; যে জিনিস সর্বকালের আছে, সেই জিনিসেরই প্রভাব ভিতরে ভিতরে খেলতে শুরু করছে। কোথায়? সমাধিতে। কোন্ সমাধি? ঘুমন্ত বা নিদ্রা সমাধি। মৃত্যু হইল একেবারে নির্বিকল্প সমাধি। একেবারে পরিষ্কার। প্রত্যেক সমাধিতে, এই ঘুমন্ত সমাধিতে যদি দর্শন হয়, যেমন স্বপ্নে দেখে, তবে মৃত্যুর সমাধিতে কি স্বপ্ন দেখবে? একই কিন্তু কথা। কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর।

প্রত্যেকটি জিনিস চিন্তা কইরা দেখবা যখন সেই জিনিসের চিন্তা কইরা (করে) যে জিনিস বের হয়, সেই জিনিস না থাকলে এই জিনিস বের হয় না, হতে পারে না। এটা একটা point মনে রেখো।

প্রত্যেক সমাধিতে দর্শন হবেই হবে। যদি এমনি সমাধিতে যাও, দর্শন হবে। যে কেউ যা হোক কিছু, একটা না একটা কিছু দেখবা। প্রতিদিন বেশীরভাগই ঘুমন্ত অবস্থায়, ঘুমন্ত সমাধিতে দর্শন হয়, মানে স্বপ্ন দেখো। এই যে দর্শন, তার কিছু মনে থাকে, কিছু থাকে না, 'কি যেন দেখছি, মনে নাই,' এইটা কইতে পারে। ঘটনা মনে না থাকতে পারে, 'দেখছি'টাতো মনে আছে।

সমাধি হলেই অনুভূতির রাজত্বে বিরাজ করে। 'সমাধি' কথাটি এত Important (গুরুত্বপূর্ণ) যোগশাস্ত্রের সর্বত্রই যে, সমাধি হলেই তার একটা ফল হবে বুঝলে। গাছের যেমন ফল হয়, তার (সমাধির) একটা ফল হবে। এক নম্বর (মাত্রা) সমাধি থেকে দুই নম্বর সমাধি, আরেকটু বেশী হবে। তিন নম্বর সমাধি, আরেকটু বেশী হবে। এইরকম মনে কর, বেশী হতে হতে হতে ১৬ মাত্রায় ১৬ নম্বর সমাধি যখন আসবে, সেই ১৬ মাত্রার সমাধিতে কি দর্শন হবে?

এই ঘুম সমাধিতে কি হয়? ঘুমের এক নম্বর সমাধিতে দর্শন হবে। দুই নম্বর ঘুম সমাধিতে দর্শনের মাত্রা আরেকটু বেশী হবে। তিন নম্বর

১৬ মাত্রায় চলে গেছে তো, আর উঠতে পারতাছে না। দেখতাছে, নিমগাছের তলায় 'ওর' body-টা। 'ও' কইতাছে, চিৎকার কইরো না, চিৎকার কইরো না। আমি তো এইখানে আছি। শব্দ নাই। দেহ পুইড়া দিছে।

ঘুম সমাধিতে দর্শনের মাত্রা আরেকটু বাড়বে। ৪ নম্বর ঘুম সমাধিতে দর্শনের মাত্রাটা আরও বেশী বাড়বে। প্রত্যেক সমাধিতে প্রত্যেক মাত্রাতেই দর্শন হবে। ১৬ মাত্রার ঘুম সমাধিতে যখন যাবে, উঠতে আর পারলো না। পইরা গেল। সেই দর্শনটা কি হবে? সেই দর্শনে নিমগাছের তলায় বইসা নিজের body-টা দেখতাছে। বুঝতে পারছো তো, কি কইলাম? এবার বুঝছো তো? সেই দর্শন হবে, ১৬ মাত্রায় চলে গেছে তো, আর উঠতে পারতাছে না। দেখতাছে, নিমগাছের তলায় 'ওর' body-টা। 'ও' কইতাছে, চিৎকার কইরো না, চিৎকার কইরো না। আমি তো এইখানে আছি। শব্দ নাই। দেহ পুইড়া দিছে। বুঝছো না? কত সহজ কইরা (করে) কইতাছি। কতবড় গুরুত্বপূর্ণ কথা এইটা। একই তো হইয়া গেল। ঐটাও তো dream (স্বপ্ন)। এই যে দর্শন, ঐটাও তো dream (স্বপ্ন)।

১ নম্বর sleep-এ (ঘুমে) dream-টা (স্বপ্নটা) পাকা হয় না। কাঁচা কাঁচা পাকা। দুধ আছে, পাতলা দুধ। মন্থন করছো, পাতলা দুধ। ননীগুলো ছ্যাপ ছ্যাপ, ছ্যাড় ছ্যাড়। ননীগুলোর বাঁধুনি নাই। concentrated নয়। ঐ দুধরে যখন জ্বাল দিছ বেশী, ১নং জ্বাল, ২নং জ্বাল, ৩নং জ্বাল, ৪নং জ্বাল যখন হবে, তারপর যখন ঐ দুধ একটু মন্থন করবে, তখন কিন্তু ঐটা আবার একটু solid হবে। মাখনটা ঐ দুধেই ভাসতে থাকবে। যতবেশী ঐটাকে পাকা কইরা নিয়া আসবা, তার থিকা মাখনটা ততবেশী পাকা হবে।

১নং দুধের গুণটা হাল্কা হাল্কা দেখে। মুছতেও পারে না, দানাও বাঁধতে পারে না। দানাটা বাঁধতে পারে না, বুঝতে পেরেছ? ঐ আধো আধো ভাব হইয়া থাকে। কথাটা কিন্তু মনে পইরা যায়, জাগে। বুঝছো?

সাধকরা কি করেন? যোগীরা কি করেন? যাঁরা যোগ অভ্যাস করেন, তাঁরা ঐ জাগ্রত অবস্থায়ই ঘুমন্ত সমাধির ১৪ মাত্রায়, ১৫ মাত্রায়

১৪ মাত্রায় যেই সমাধি হইয়া গেল, ঘুমন্ত সমাধিটা যদি জাগ্রতে আনতে পার, তুমি আবার তোমার আত্মাটা দেখবা, আত্মাটা ঘুরতে আরম্ভ করছে। ১৪ মাত্রায় যখন তুমি বইসা পড়লা, মৃত্যুর আর ২ মাত্রা বাকী, দেখলা, তোমার আত্মাটা যাচ্ছে। বুঝলা?

নিয়ে যান। ১৬ মাত্রায় last (শেষ)। তারা ঐ প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক ইত্যাদি নামানামি কইরা, জপতপ কইরা খিঁচামিচা যাই হোক, যেভাবেই হোক, ১৪ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। ১৪ মাত্রায় গেলে স্বাভাবিকই গভীর সমাধি হবে। ১ মাত্রার ঘুমই তো কত বড় ঘুম। ১ মাত্রায় কত ঘুমায়। ২ মাত্রায় ঘুম আরেকটু বেশী হবে। ঘরে চোর আইলেও টের পাওয়া যায় না। ৩ মাত্রায়, ৪ মাত্রায় আরও বেশী হবে। আর ১৪ মাত্রায় যার হবে, তার কি অবস্থা। ১৪ মাত্রায় যেই সমাধি হইয়া গেল, ঘুমন্ত সমাধিটা যদি জাগ্রতে আনতে পার, তুমি আবার তোমার আত্মাটা দেখবা, আত্মাটা ঘুরতে আরম্ভ করছে। ১৪ মাত্রায় যখন তুমি বইসা পড়লা, মৃত্যুর আর ২ মাত্রা বাকী, দেখলা, তোমার আত্মাটা যাচ্ছে। বুঝলা? আত্মাটা ঘুরতাছে, কাজ করতাছে, আসতাছে, তুমি বুঝতে পারতাছ তো? চমৎকার।

এক নম্বরে যখন যায়, পাকা নয় বলে ধরা যাচ্ছে না। ১৬ মাত্রায় যখন যাবে, যদি ধ্যানে হয়, তাইলে গিয়া ঘুইরা টুইরা, কাজকর্ম সাইরা (সেরে) আবার আইসা ঢুইকা (ঢুকে) পড়বে।

ভাল বুঝতাছ, নিজেই বুঝতাছ। কারণ ঘুমন্ত সমাধিটা জাগ্রতে আনতে পারলে, সেটার মধ্যে control অবস্থাটা থাকে, সেটার মধ্যে আয়ত্তে থাকে। ঘুমন্তটার মধ্যে আয়ত্ত থাকে না। কারণ সেটা তো রেওয়াজ করা না। সেটা হল প্রকৃতির সহজাত দান। সেই দানটা তোমরা ব্যবহার করছো। ওর মধ্যে তোমার পাকাপাকি কিছু নাই। ধরাধরি তোমাদের কিছু নাই। আর ঐটা (ঘুমন্ত সমাধিটা) যখন পাকাপাকি হইয়া গেল, যখন জাগ্রতে আনতে পারলো, তখন ইচ্ছা হইল, সে ঘুরতাছে। ১৪ মাত্রায় তো, ঐ অবস্থায় সে ঘুরবে, ফিরবে। ঐ অবস্থায় দেহটারে বসাইয়া রাইখা ঘুইরা বেড়াইয়া সে আইসা আবার ঢুইকা পড়লো। এই তোমাদের ১ মাত্রায় ঘুইরা ফিরা আইসা যেমন ঢুকতেই আছে, তেমন আর কি। ১৬ মাত্রায় যখন হয়েই যাবে, তখন কোথায় ঘুরবে? তখন সবটাই বেরিয়ে গেছে। এক নম্বরের মতনই বেরিয়ে যায়। এক নম্বরে যখন যায়, পাকা নয় বলে ধরা যাচ্ছে না। **১৬ মাত্রায় যখন**

যাবে, যদি ধ্যানে হয়, তাইলে গিয়া ঘুইরা টুইরা, কাজকর্ম সাইরা (সেরে) আবার আইসা ঢুইকা (ঢুকে) পড়বে। (এটাই ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধি।)

এইখানে গৌরীশঙ্কর (আবাসিক) বইয়া রইছে, হারু (আবাসিক) বইয়া রইছে আমি বেরিয়ে গেলাম। 'গৌরীশঙ্কর, একটা কাজ করতো, body-টারে ধইরা রাখিস্। আমি আইতাছি।' এরকম অনেকবার বলছি।

কাছারি ঘরে বইসা রইছে সব। দরজা জানালা বন্ধ কইরা বইসা রইছে। আমি জানালায় দাঁড়াইয়া আশু সেনকে বলছি; 'জ্যাঠামশাই, ভাল আছেন তো?'

-- আরে তুমি বাইরে দেখি।

-- হ্যাঁ, একটু বাইরে আছি।

-- আরে ভিতরে দরজা বন্ধ দেখি। তুমি তো এখানে বসা।

-- আমি বেরিয়ে আসছি।

-- 'আরে সর্বনাশ।' জানালার বাইরে দাঁড়াইয়া কথা বলতাছি। ওরা ঘরে বইসা শুনতাছে।

-- জানালার বাইরে দাঁড়াইয়া, 'জ্যাঠামশাই আমি একটু আসি। আপনারা body-টারে স্পর্শ করবেন না। আপনারা বসে থাকেন। আমি একটু ঘুরে আসি।' ঘুইরা আইসা, জ্যাঠামশাই আমি আসছি। দরজাটা খুইলা (খুলে) দেন। আমি রগড় করছি। দরজাটা খুইলা দেন।

-- দরজা খুলুম কারে? তুমি তো এখানে বসাই।

-- দরজাটা খুলুন না একটু খানি।

-- হাসাইলা তুমি। বাইরাইয়া গেছো এমনে। তারে আবার দরজা খুইলা দিতে হইব।

-- আমি খেলা করবো। দরজাটা খুলছে। দরজাটা খুলছে পরেই, 'আসি?'

-- আরে, তুমি কই? তুমি কোথায়?

-- এই যে আমি আইতাছি। আপনার কাছেই যাইতাছি। আইয়া (এসে) দেহের মইধ্যে ঢুইকা (ঢুকে) পড়লাম। আমি আইতাছি, আইতাছি কইতাছি। ঘরের মধ্যে ওরা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু দেখতে পাইতেছে না।

বাতাসটা দেখোস্? গায়ে লাগে বলে তো? এটাও এরকম। লাগতাছে। কথা শুনতাছে (শুনছে)। দেখতে পাইতেছে না। বাতাসটার মতন, কত কঠিন বিষয় কত সহজ কইরা কইয়া দিতাছি।

-- শব্দটা শোনা যায় কি করে?

-- **১৬ মাত্রায় ধ্যানস্থ সমাধিতে যে আত্মা বেরিয়ে গেল, সে একটা solid form নিয়ে বেরিয়ে গেল, তাই তার কথা শোনা যেতে পারে।** সে (আত্মা) আবার ঘুরে ফিরে এসে দেহের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। ঐটাতো Control হইয়া গেল। মাখনটাতো solid হইয়া গেল। চাকা বাইন্ধা গেল। বরফে দিলে আরও চাকা বাঁধবো। ঢিলা (ঢিল) মারণ যায়। ঐ যা বের হল ১৬ মাত্রায়, একেবারে solid একটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর একেবারে দেইখা শুইনা (দেখে শুনে), কথাবার্তা কইয়া (বলে) গুছাইয়া গাছাইয়া (গুছিয়ে গাছিয়ে) গেল।

আর এই ১নং eye (চক্ষু) দিয়া দেখতে পারে না। সাধারণ মানুষের চক্ষু হইল ১নং ঘুমের চক্ষু; ৫নং ১০নং হইলেও কিছুটা বুঝতে পারতো। ১ নম্বরের চক্ষু দিয়া ১৬ নম্বরের বিদেহীকে দেখতে অসুবিধা হইয়া যাবে। তোরে যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের থিকা একটা পোকা আইনা (এনে) দিই, 'দেখতো, পোকাটা কত বড়।'

-- তুই কবি, (বলবি) নাতো, কিছু নাই তো।

আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র আইনা দিলে দেখবি, এতবড় একটা আরশোলার মত পোকা ঘুরতাছে। এই ১৬ নম্বর যখন বেড়িয়ে যায়, ফাঁস লটকাইলে বা বিষ খেলে ১৬ নম্বরেই বেড়িয়ে গেল। বেড়িয়ে গিয়ে তো ফ্যাসাদে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হইতে শুরু করে। দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। হঠাৎ গিয়া তোমার ঘরে উপস্থিত হইতে পারে। Motion-এ (মোশনে) চলে যায়।

এই যে কুয়াশাগুলি পড়ে, কোন কোন জায়গায় বরফে চাকা বাইন্ধা যায়। তখন বলে বরফের ঝড়। এখন হইল কুয়াশার ঝড়। ১৬ নম্বরে এই যে আত্মাটা বাইরাইয়া গেল স্বপ্নের মতন, সেটা সে নিজেই দেখতাছে (দেখছে)। কিন্তু দেহে ঢুইকা তারে স্মরণ কইরা (করে) দেওয়ার মত যন্ত্রপাতি বন্ধ হইয়া গেছে। তাই দেহটা পুইড়া (পুড়িয়ে) ফেলাইছে। 'ও' চক্ষের সামনে দেখতাছে, অর (ওর) দেহটা পোড়াইয়া ফেলাইতেছে (ফেলছে)।

১৬ নম্বরে এই যে আত্মাটা বাইরাইয়া গেল স্বপ্নের মতন, সেটা সে নিজেই দেখতাছে (দেখছে)। কিন্তু দেহে ঢুইকা তারে স্মরণ কইরা (করে) দেওয়ার মত যন্ত্রপাতি বন্ধ হইয়া গেছে। তাই দেহটা পুইড়া (পুড়িয়ে) ফেলাইছে। 'ও' চক্ষের সামনে দেখতাছে, অর (ওর) দেহটা পোড়াইয়া ফেলাইতেছে (ফেলছে)।

-- আর তো আমার ঢোকার কোন পথ নাই। সব collapsed হইয়া গেছে। 'ও' বুঝতে পারতাছে (পারছে)। আমি তো উপস্থিত আছি। তোমরা কান্দ কিয়ের লইগা (কাঁদছো কেন)? 'ও' বলতে চাইতেছে। কিন্তু শব্দ শোনা যাইতেছে (যাচ্ছে) না। যন্ত্রই নাই। অনেক সময় আবার উপস্থিত হইয়া যায় গিয়া। Motion-এর (মোশনের) ঠ্যালায় আইয়া (এসে) পড়ে। বুঝতে পারছো?

যাহা ভিতরে আছে, সেটাই প্রকাশ পাবে। নাহলে স্বপ্নটা দেবার কোন কারণ নাই। এমনি এমনি মাথাগরম হইলে হয়, দুশ্চিন্তায় হয়। যা খুশী তাই হোক। কিন্তু কেন এই ধরণের ঘটনা ঘটবে?

তুমি ব্যক্তি শুয়ে আছ, সেই ব্যক্তির অন্যখানে যাওয়ার Nature-র (প্রকৃতির) কোন নিয়মই থাকা উচিত নয়। যখন সে ঘুমিয়ে আছে পাথরের মত, তার থেকে আর একটা দানা বেরিয়ে গেল। সে ভিতরেই থাকুক, বাইরেই ঘুরুক, যেভাবেই হোক, ঘটনা তো ঘটে যাচ্ছে। যখনই ঘটনা ঘটবে, তখনই বুঝবে, ঘটনা না থাকলে ঘটনা ঘটে না। চুলটা যখনই তোমাগো হইছে দেখলা একটা বুড়া বইসা রইছে। তখনই মনে করবা, পাকাচুল আছে বইলাই আমার চুলটাও পাকবে। কালোটাই ধরার ইঙ্গিত দিচ্ছে। শুভ্রকেশ যাকে বলে, শুভ্রের ইঙ্গিত কালোতে দিয়ে দিচ্ছে। বুঝতে পারছো? একটা কথা আছে না, অন্ধকার থাকলেই আলো আসে। এইটা হইল focus (ফোকাস্)। অন্ধকারটা কোত্থেকে আসবে? অন্ধকার সৃষ্টিটা কার থেকে হবে? যখনই দেখবে, সৃষ্টি থাকবে, আরেকটা সৃষ্টি না থাকলে সেই সৃষ্টিটা হতে পারে না। যখনই dark দেখবে, তখনই মনে করবে, একটা light আছে। কিছু light না থাকলে এই dark রূপটা কেন আসবে? এই রূপে অনিশ্চয়তা হতে পারে না, আমরা যখন আলোর সামনে আছি। প্রত্যেকটা জিনিস যুক্ততায় আছে। অন্ধকার অন্ধকারই।

যখনই dark দেখবে, তখনই মনে করবে, একটা light আছে। কিছু light না থাকলে এই dark রূপটা কেন আসবে? এই রূপে অনিশ্চয়তা হতে পারে না, আমরা যখন আলোর সামনে আছি। প্রত্যেকটা জিনিস যুক্ততায় আছে। অন্ধকার অন্ধকারই।

একটা ছায়া দেখছো, লোকটা নাই। ছায়া এদিক ওদিক ঘুরতাছে (ঘুরছে)। একটা ছায়া ওদিক দিয়া পড়ছে, তুমি ভাবছো, লোকটা কোথায়? যখনই ছায়া দেখবে, বুঝবে, কায়া না থাকলে ছায়া থাকতে পারে না, মনে রেখো। কায়া থাকলে ছায়া হবে। কায়া ছাড়া ছায়া হতে পারে না। সুতরাং এই যে, কায়ার মধ্যে ছায়া খেলতেছে স্বপ্নে ছায়ার মতন, কায়া আছে বলেই ছায়া। এই যে ঘটনাটা ঘটতাছে, কেন ঘটতাছে? কোন কারণ নাই। এটা দেহের কোন অঙ্গের কারণ ছিল না। মাথা গরমেই হোক, আর যাই হোক, সমাধিতে হচ্ছে কি না, ঘুমের মধ্যে হচ্ছে কি না।

যখনই ছায়া দেখবে, বুঝবে, কায়া না থাকলে ছায়া থাকতে পারে না, মনে রেখো।

ঘুমটা হচ্ছে মৃত্যুর একটা পূর্বাভাষ। সূর্য উঠবার আগে একটা পূর্বাভাষ হয় না? ঘন্টাখানেক আগে থেকেই শুরু হয়। এটা পূর্বাভাষ। পূর্বাভাষের জন্য অনেকরকম ইঙ্গিত থাকে। অনেকরকম সব থাকে। এই যে পূর্বাভাষ, প্রতিদিন কিন্তু তোমরা Introduction-ই পড়তাছ; লেখতাছ প্রতিদিন। কিন্তু বই আর খোলা হল না। যখনই পড় তখনই Introduction (পূর্বাভাষ)। কি Introduction? এই চল যাই। রাত্র হয়ে গেল। Introduction-টা পড়ি, শুয়ে পড়ি। বিছানাটা পাত, মশারিটা টানাও। বড় মশা। কোল বালিশটা তুই নিছোস্ ক্যান? আমারে দে। আমি কোল বালিশ ছাড়া শুইতে পারি না। এইটা হইল Introduction (পূর্বাভাষ)। মৃত্যুকে কিভাবে আহ্বান করছো, কি সুন্দরভাবে। এইবার কাত হইলা। দুজনে এতক্ষণ কথাবার্তা কইয়া একজন পূবে, একজন পশ্চিমে। তারপর হারিয়ে গেলা। হারিয়েই গেলা কিন্তু। ৪/৫ ঘন্টা একেবারে হারিয়েই গেলা। হারিয়ে গেছ কোন কিছু নিয়ে না। কোন কিছুই না।

'ও' আইলে এই করুম। কালকে বাজারটা এই করুম। উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরাইয়া দিমু। অরে তো কইলাম না টুলটা দিতে। শুইয়া রইলা।

তারপর দেখতাছ, মাত্র চোখটা বুজছে। 'এই তাড়াতাড়ি কর। খড়দা যাইতে হইব। তাড়াতাড়ি কাপড়টা পইরা লই (পরে নিই)।' এত সখ করে মশারি টানাইয়া ভাল কইরা (গুইজা) সবে শুইছো, 'ওই আইছে রে আইছে। আমাগো নিতে আইছে। কে কে যাবি চল।' দৌড় দিয়া গাড়ীতে উঠছো। খড়দা গিয়া পৌঁছাইলা। স্বপ্নের মধ্যে দেখতাছ। 'আইছি লো আইছি। তগো (তোদের) বাড়ীতে আইছি। কি কি আনছোস্? কি কি রান্না করতে হইব, বল?' কি সুন্দর বিছানায় ফ্যানের তলায় ঘুমাইয়া রইছে, কত সুন্দরভাবে। আর অরে (ওকে) খড়দার বাড়ীতে নিয়া রান্নাঘরে ঢুকাইয়া দিছে। রান্না করলো। এই তাড়াতাড়ি খা। এই, ওইটা ঢাকতো, এইটা করতো।

ঘটনাগুলি কি হয়, তার কোন দাম নাই। যা মনে আইতাছে করতাছে, চলতাছে, ঘুরতাছে এইগুলির কোন Importance (গুরুত্ব) দিই না। কিন্তু এই যে হচ্ছে, হওয়াটার পিছনে যদি হওয়ার বস্তু না থাকে, তবে প্রকৃতি কখনও অযথা তোমাকে বিব্রত করতো না।

এরমধ্যে একজন গিয়া ধপাস্ কইরা শুইয়া পড়লো। এদিকে ঐ বাড়ীরই একজন গিয়া কইতাছে, 'তুই এখানে? ও দিকে ডাকাডাকি করতাছে।' তার (ক) সঙ্গে ঐ মহিলার (খ) ঝগড়া লাইগা (লেগে) গেছে। কথা হইতাছে। তর্ক হইতাছে। তর্ক হইতাছে। হঠাৎ হাঁই ..... জাইগা (জেগে) উঠছে। কি দেখলাম। খড়দা বাড়ী গেলাম। রান্না-বান্না করলাম। কতদিন পরে গেলাম।

ঘটনাগুলি কি হয়, তার কোন দাম নাই। যা মনে আইতাছে করতাছে, চলতাছে, ঘুরতাছে এইগুলির কোন Importance (গুরুত্ব) দিই না। কিন্তু এই যে হচ্ছে, হওয়াটার পিছনে যদি হওয়ার বস্তু না থাকে, তবে প্রকৃতি কখনও অযথা তোমাকে বিব্রত করতো না।

নাক দিয়া তো আর পায়খানা হয় না। নাক দিয়া যেদিন পায়খানা হবে, সেদিন বুঝবা তুমি শেষ হয়ে গেলা। নাক দিয়া, মুখ দিয়া সাধারণতঃ পায়খানা হয় না। অনেকসময় পিচ্কারির মত বাইরাইয়া যায়। হয়তো? হয় না?

এইটা হইল ১ বলকের দুধ। সুতরাং ক্ষীর হওয়া মুস্কিল হইয়া পড়ে। ঘটনাটা ঠিক হবে, যদি ৫ বলক, ৬ বলকের মধ্যে থাকে। তখন এই স্বপ্নটা correct হবে। কম্পিউটার মেশিনের মত answer (উত্তর) দেবে। এত এত এত এত গুণ, result (রেজাল্ট) moment-এ (মুহূর্তে) বেরিয়ে গেল। আরেকজনের ১৫ মিনিট লাগতাছে। আমি কম্পিউটারে যদি বসি, ৫/৭ সেকেন্ডে বের করে ফেলবো। ঘুমটা যদি ৬ বলকের থাকে প্রতিদিন, তাহলে হয়। এখন যদি বল, ৬ বলকের ঘুম কি করে হবে?

৬ বলকের ঘুম তুমি ইচ্ছা কইরা আনতে পারবো না। সাধারণতঃ ১ বলকের ঘুমই বেশী থাকে। সোয়া বলকে যায়, দেড় বলকও হইতাছে।

৫ বলকে যদি যায় ঘুমটা, সেটা কিরকম হবে? হঠাৎ তুমি ঘুমাইয়া পড়লা। ইচ্ছাটা জাগছে তোমার, 'কিভাবে আমার দর্শন হবে? কিভাবে আমি পেতে পারি?' আমি যদি শিবের দর্শন পেতাম, কত ভাল হতো। আমাকে যদি শিব বলতেন, 'তুই এইভাবে কাজ কর।' নিশ্চয়ই আমি সেভাবে করতাম। যাঁরে তোমার ভাল লাগে, তাঁরে নিয়াই কথা কইতাছ। ৫ বলকে

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

হঠাৎ দেখলা, তুমি চলছো, কোন জন মনুষ্য নাই। একটা জঙ্গল, একটা পোড়ো বাড়ী, পাশ দিয়ে তুমি যাচ্ছ। ভিতর থেকে একটা টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে আর একটা গুরু-গম্ভীর শব্দ আসছে। গিয়ে দেখলে, একটা শিবলিঙ্গ। হঠাৎ শুনলে, তুই আমাকে খোঁজ করেছিলি?

-- কথা বলছেন?

-- হ্যাঁ বাবা। তুই কি চাস্ বলতো?

-- আমি চাই সবসময় যেন তোমার দর্শন হয়।

-- তুই একটা কাজ কর। তুই অমুক জায়গায়, অমুক স্থানে গিয়ে দেখবি, একটা বটগাছ। সেখানেও দেখবি, এরকম একটা পোড়ো বাড়ী। তুই সেখানে গিয়ে তিনদিন সাধনা করবি। একভাবে জপ করবি।

তুমি হঠাৎ জাগলে, 'কি দেখলাম?' তুই চলে গেলি। সেই গ্রামও পেয়ে গেলি, সেই জায়গাও পেয়ে গেলি, সেই স্থানও পেয়ে গেলি। তুই নিবিষ্টমনে জপ করতে বসে গেলি, 'হা ঠাকুর, হে ঠাকুর, হা ঠাকুর। হে দেবের দেব মহাদেব, তুমি দয়া করো, তুমি দয়া করো,' বলতে বলতে সেখানে আবার ঘুমিয়ে পড়লি। সেইখানে দেখলি, আরেক ঠাকুর।

-- আমি তোর কাছে এলাম। তোর আর কিচ্ছু করতে হবে না। তুই বাড়ী চলে যা। এই নাম দিয়া দিলাম। জপ করবি। মাঝে মাঝে আমি তোকে দেখা দেব।

তুই বাড়ীতে চলে এলি। নাম করতাছোস্ (করছিস্)। মাঝে মাঝে দর্শন হয়। এই কথাগুলি কিন্তু মিলতাছে।

আবার ১ বলকের দুধেও কথা একেবারে যে না মিলে তা নয়। অনেকসময় মিলে যায়। ১ বলকের ঘুমেও অনেকের মধ্যে ২/৪ টা মিলে যায় অনেক সময়।

১১ বলক, ১২ বলকে যদি ঘুম হয়, গভীর সমাধি, তুমি জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জপ করছো, তারমধ্যে যেটা দেখবে, সেটা পাকাপাকি অনেকটা হয়ে যায়।

আর ১ বলকে, ২ বলকের ঘুমে অস্তিত্বটা আছে, সত্যতা আছে, সবই আছে। কিন্তু কোনটাই পাকাপারি নয়। সবটাই একটু কাঁচা কাঁচা।

সবচেয়ে বড় যেটা হল, মৃত্যুর পরে কি, এটার তো কেউ সমাধান করতে পারতেছে না। সমাধান করতে পারবে না? প্রকৃতি কখনই এমন কোন তার জিনিস লুকিয়ে রাখেন না, যেটা প্রমাণের মাধ্যমে না আসে। সবটাই কিন্তু প্রমাণের মাধ্যমে আসে। সেগুলো যে প্রমাণের মাধ্যমে আসে, সেটা কেউ ধারণাও করতে পারবে না। ওরা (এখানকার বেশীর ভাগ শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিকরা) আরেক লাইনে চলে গেছে। ওরা কল্পনার লাইনে চলে গেছে। তাতে তারা ঠিক সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারছে না, বুঝতে পারতেছে না। কিন্তু এটা ধরে রাখার, বুঝবার জিনিস, সবটাই আছে। বুঝছোস্ কথাটা? বুঝছোস্ তো? (বুঝেছিস তো)

কচ্ছপের মাথাটা জল খাওয়ার জন্য হাঁ করতাছে, body-টা দেখতাছে, আর মনে মনে ভাবতাছে, 'এই কি হইল?' দুইটা কিন্তু আলাদা। মাথাটা জলের জন্য হাঁ করতাছে আর এখানে body-টা দাপাইতেছে। দুইটা দুইদিকে separate. চৈতন্য কিন্তু দুইটার মধ্যেই রয়েছে।

পাঁঠার মাথাটা এখানে, দেহটা কিন্তু দাপাইতেছে। হচ্ছে কিন্তু motion-এ, যেটা motion-এ হয়ে গেল। Death হয় নাই। দেহটার মধ্যে sense জাগ্রত, দাপাইতেছে। ধরলে আবার ছিট্কা মারে। মাথাটার মধ্যেও চৈতন্য আছে। Death হয় নাই। পা দিয়া যে মারল, sense না থাকলে মারলো কেটা? sense থাকে। Brain না থাকলে মারলো কেটা? Charge করতে গেছে। ঠাটাইয়া একখান দিয়া বইছে। কাজটা করলো কেটা? sense থাকে। sense তার নিজস্ব মাত্রায় থাকে। Brain থাকে। তারজন্য সেই কাজটা হইয়া যাইতেছে।

এই বাস্তব জগতের বিষয়বস্তুগুলি যে ইঙ্গিত দিয়া যাইতেছে, সেই ইঙ্গিতের ধারা ধইরা ধইরা বিষয়টি বুঝতে হবে। এ যে কতবড় ইঙ্গিত ভাবলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। প্রতিটি প্রাণীর দেহের মাঝে জীবিত অবস্থায় চেতনার সুরটা সাময়িকভাবে (যে প্রাণী যতবছর বাঁচে) থাকে, যেটা দেহকে ফেলে মৃত্যুর পর চলে যায়। কিন্তু ঐ দেহটারও, মৃতদেহটারও চেতন থাকে; কতবড় ক্ষমতা। ছোটবেলায় দেখছি, গলা কাটা কচ্ছপ, কাঠি দিছি, কামড়াইয়া ধরছে। পাঁঠাকে গলা কাইটা ফেলাইলেও ঠ্যাং নাড়াইয়া দাপাইতে থাকে, অনেকেই দেখছো। তখনও sense-টা, চেতনাটা থাইকা যায়। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চেতনা বা চৈতন্য লুপ্ত হইয়া গভীর থিকা গভীরতর স্তরে জাপ্য হইয়া থাকে। তখন আর কোন সাড়া নাই। জীবনের কোন অবস্থার সাথে মিলতি নাই।

এই যে চেতনাটা লুপ্ত হইয়া অচেতন অবস্থায় থাকা, এই অবস্থাটা মৃতদেহকে রক্ষা করার জন্য। এই দেহকে রক্ষা করার অবস্থা কে সৃষ্টি করলো? এই সৃষ্টি যে নিয়মে হইছে, সেই চেতন বস্তুর দ্বারাই পৃথিবীর নিয়মে ঐ অবস্থায় পইড়া রইছে। ঐ অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য কতবড় শক্তি যে ব্যয় হইয়া যাইতেছে, ভাবলে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। sense না থাকলে, চেতনা না থাকলে মৃতদেহের বিকৃতি বা পচনের সাথে সাথে, তার থিকা নানা কীটের (জীবাণুর) সৃষ্টি হইতে পারতো না। চেতনা বা চৈতন্য থিকাই জীবের সৃষ্টি - ইহা সর্ববাদীসম্মত।

তাই sense বা চৈতন্য সর্বদাই রইছে প্রতিটি বস্তুর মাঝে। মহাশূন্য মহা সচেতনতায় ভরপুর। খুঁজতে গেলে তাঁরে খুঁইজা পাওয়া যায় না। খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হইয়াই তিনি রইছেন। আবার প্রতিটি বস্তুর বস্তুত্বের মাঝে, তার অস্তিত্বের মাঝে সেই সাড়ার সাড়া জাগাইয়া দিয়া চলছেন। প্রকৃতির এই রহস্য চিরন্তন। প্রকৃতির এই রহস্যের আজও হয়নি কোন সমাধান।

"রাম নারায়ণ রাম"

ঘুম স্বপ্ন বাস্তব সাধনা

(২১-০৩-১৯৯০)

(শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভক্ত শিষ্যের জীবনে স্বপ্ন এবং বাস্তব একাকার হয়ে গিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনে দিনের বেলা সে সাধারণ মানুষের মত ঘরসংসার করতো। কিন্তু ঘুমের সাথে সাথে সে চলে যেত আরেক স্বপ্নময় জগতে। সেখানেও তার ঘরসংসার স্ত্রী, কন্যা সবই ছিল। এই স্বপ্নের ঘরসংসারে প্রতিদিনই ছিল তার আনাগোনা। সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো, কখন তার ঘুমোবার সময় হবে এবং সে তার ঐ স্বপ্নের জগতে যেয়ে সুখের সংসার করতে পারবে। শ্রীশ্রীঠাকুরই তাকে জাগ্রত এবং স্বপ্নের জগতে নিয়মিত ঘর সংসারের এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।)

অর (সেই ভক্তশিষ্যের) চিন্তা কইরা বাইর করতে হয়, কোন্ ঘরে আছি রে। হঠাৎ হঠাৎ অর (ওর) মনে পড়তাছে একেকটা জগতের কথা। বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন কোনটাই ঠিক করতে পারতেছে না। এই জায়গার মোহটা অর ঢিলা হইয়া গেছে। এই জায়গার কাজ সাইরা (সেরে) চইলা যাইতে চাইতেছে। অর ঘর বাড়ী সব (স্বপ্নের জগতে) আছে তো। বিরাট, বাড়ী ঘর, ফ্যান, লাইট বিরাট ব্যাপার। আর এইটা (বাস্তব জগৎ) হইল আধা মরার জায়গা। ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) ও শান্তিতে আছে। বিরাট শান্তিতে আছে। ঘুমের মধ্যে বাচ্চা হইছে। আমার কাছে আইছে, 'বাবা, আমার একটা বাচ্চা হইছে, নাম দিয়া দাও।' আমি নাম দিলাম, 'পূর্ণিমা।'

ঘুমের মধ্যে বাচ্চা হইছে। আমার কাছে আইছে, 'বাবা, আমার একটা বাচ্চা হইছে, নাম দিয়া দাও।' আমি নাম দিলাম, 'পূর্ণিমা।'

দিনের বেলা এখানে (বাস্তব জগতে) খাইতে চায় না কিছু। অবস্থা বুইঝো। ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) চান করে। ঐখানে হাট, বাজার করে। কত কিছু খায়। লঞ্চ আছে, লঞ্চ নিয়া বের হয়। অসুবিধা নাই তো কিছু। দিনের বেলা এইখানে (বাস্তব জগতে) খায় না কিছু; রাতের বেলা ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) গিয়া কতকিছু খাইতাছে। খুব ভাল আছে। কাম (কাজ) করে। যেমন, এখন আমেরিকায় ভোর। আমেরিকার সঙ্গে India-র ৮,০০০ মাইল difference (পার্থক্য)। মনে কর, এখন আমেরিকায় ভোর হইছে। দিনের বেলা India-য় কাম (কাজ) করলি, আর ঐখানে আমেরিকায় রাত্রিবেলা গিয়া শুইলি। অথবা এইখানে রাত্রিবেলা শুইলি, দিনের বেলা আমেরিকায় গিয়া কাম (কাজ) করলি। দুইটা সংসার হইয়া গেল তো। অর স্বাস্থ্যও ভাল হইয়া গেছে। দিনের বেলা সংসার। আবার রাত্তির বেলা সংসার। আমেরিকা, ইন্ডিয়া। ঐটাই (স্বপ্নময় জগৎটা) তার day হইয়া গেছে, আর এইটাই (বাস্তব জগৎ) তার blocked হইয়া গেছে। এইজন্য এখানে কোন আকর্ষণ নাই। এখানের কোন কিছুতে যায় না। সকাল সকাল (তাড়াতাড়ি) আইসা (এসে) হাত পা ধুইয়া বিছানা কইরা শুইয়া পড়ে। ৮/১০ ঘন্টা ঐখানে সংসার করে, জমিদারী দেখাশুনা করে ঐখানে, কাজকর্ম করে, বিরাট অবস্থা।

এখানের কোন কিছুইতে যায় না। সকাল সকাল (তাড়াতাড়ি) আইসা (একে) হাত পা ধুইয়া বিছানা কইরা শুইয়া পড়ে। ৮/১০ ঘন্টা ঐখানে সংসার করে, জমিদারী দেখাশুনা করে ঐখানে, কাজকর্ম করে, বিরাট অবস্থা।

যেখানে ছয়মাস রাত্র, সেখানে কি অবস্থা? তারা ঘন্টা ধইরা (ধরে) পর্দা দেয়। এই এখন ছয়টা বাজলো, দশটা বাজলো, পর্দা দিল। আবার পাঁচটা বাজলো। ঘুম থিকা উঠলো। কাজ-কর্ম শুরু করলো।

যেখানে ছয়মাস (দিন) day, তারা কি করে? তারা ঘড়ি দেইখা সব করে। পর্দা দিয়া দিল, ঘুমাইয়া পড়লো, তারপর আবার পাঁচটা, ছয়টার সময় উঠলো। ব্রাশ করলো, দিনের বেলাই সব করতাছে। খাওয়া-দাওয়া করলো, অফিস গেল। স্কুলে গেল। স্কুল থিকা আইল, time দেইখা বিকাল হইল। সূর্য তো একদিকেই আছে। পড়াশুনা করলো। খাওয়া-দাওয়া করলো। দশটা বাজলো, পর্দাটা টাইনা দিয়া শুইয়া পড়লো। কি অবস্থা।

সুতরাং ঐটা (স্বপ্নের জগত) ওর জমিদারী। ঐখানে পুরাদস্তুর সংসার করতাছে। সবকিছু দেখাশুনা করতাছে লোকজন আইতাছে। তাগো (তাদের) লগে (সঙ্গে) কথাবার্ত্তা কইতাছে। সব কিছু করতাছে। আর এখানে (বাস্তব জগতে) অভাব। অভাবের সংসার। এখানের কোনকিছুই অর ভালো লাগতেছে না। ওখানের (স্বপ্নের জগতের) থিকা (থেকে) টাকাটা এখানে (বাস্তব জগতে) আনতে পারতেছে না। হাওলাত (ধার) আনা দরকার। ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) কত টাকা। এখানে (বাস্তব জগতে) অর আর ভালো লাগতাছে না। গাড়ী থিকা আর নামতে ইচ্ছা করতাছে না। কখন রাত্রি আইব (আসবে), অপেক্ষা কইরা রইছে। যা আসছে, যা ঘটছে, সব মায়ার খেলা।

যা ঘটছে, কোনটাই ঠিক নাই। 'ও' এখন দ্বন্দ্বে আছে। ঐটাই (স্বপ্নের জগৎটাই) ঠিক, না এইটাই (বাস্তব জগৎটাই) ঠিক। স্বপ্নে হ'ল quick action স্বপ্নে কাজ তাড়াতাড়ি হয়। আর বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় অত তাড়াতাড়ি হয় না। ঐটারে, স্বপ্নের জগৎটারে permanent কইরা নিছে। স্বপ্নের metre-টারে যদি বাস্তবে রাখা যায়, তাইলেই success, অদ্ভুত।

তুই যে আমার (শ্রীশ্রী ঠাকুরের) লগে কথা কইতাছোস্ এইটারে 'ও' (ভক্তশিষ্য) ঐখানে (ঘুমের মধ্যে স্বপ্নাবস্থায়) কইতাছে, ঠাকুররে স্বপ্নে দেইখা আইছি। 'ও' (ভক্তশিষ্য) আমার কাছে আইসা আমার লগে কথাবার্তা কইয়া গেছে। 'ও' ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) গিয়া কইতাছে, আমি স্বপ্নে ঠাকুরের দর্শন পাইছি। একটা ঘরে যদি* পঞ্চাশটা আয়না থাকে, তবে পঞ্চাশটা মুখ দেখবো না? 'ও' তো শুইয়া রইছে। ঘুমের মধ্যে

যা ঘটছে, কোনটাই ঠিক নাই। 'ও' এখন দ্বন্দ্বে আছে। ঐটাই (স্বপ্নের জগৎটাই) ঠিক, না এইটাই (বাস্তব জগৎটাই) ঠিক। স্বপ্নে হ'ল quick action স্বপ্নে কাজ তাড়াতাড়ি হয়। ঐটারে, স্বপ্নের জগৎটারে permanent কইরা নিছে। স্বপ্নের metre-টারে যদি বাস্তবে রাখা যায়, তাইলেই success, অদ্ভুত।

* স্বপ্নে মনের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থাকে না, তখন মন থাকে স্বচ্ছতায় ভরপুর। সেই স্বচ্ছ মনে নানা অসম্ভব কাজ অনায়াসে করা যায়। বাস্তবে যেটা করার চিন্তাও সম্ভব নয় বলে মনে হয়। স্বপ্নে মনটা যেন দর্পণস্বরূপ অর্থাৎ আয়নার মত হয়ে যায়। স্বপ্ন সমাধির অবস্থায় মনে যা যা চিন্তা আসে, সবগুলিই আয়নায় মত তার মনে প্রতিবিম্বিত হয়।

তো রাজত্ব আরম্ভ করছে। ঐখানে বউরে কইতাছে, আত্মীয় স্বজনরে কইতাছে, আমি স্বপ্নে ঠাকুররে দেখছি। ঠাকুর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ঠাকুর আমারে আশীর্বাদ দিয়া দিছেন। ও এইটারেই (বাস্তব জগৎটারেই) স্বপ্ন কইতাছে। আবার যখন জাগে এইখানে, আবার কইতাছে, স্বপ্নে আমি কালকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা পাইছি। Cash পেয়েছি। আমার ব্যাঙ্কের (cheque) চেক বই আছে। আমি টাকা রেখে দিয়েছি। এখানকারটা (বাস্তব জগতেরটা) ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) নিতে পারে না। ঐখানেরটা (স্বপ্নের জগতেরটা) এইখানে (বাস্তব জগতে) আনতে পারে না। কামড়াকামড়ি আরম্ভ হইছে। আবার ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) যাইয়া কইতাছে, 'ঐখানে আমার জিনিস পড়ে আছে, আনতে পারি নাই। দেনাদাররা, পাওনাদাররা আমায় উৎপাত করতাছে, আমি টাকা দিতে পারি নাই। স্বপ্নে আমি দেখতাছি।' আমার জমিদারী এত। আমারে পাওনাদাররা তাগাদা করতাছে, টাকা দিতে পারতাছি না।

কর্মচারীরা বলতাছে, বাবু, আপনারে পাওনাদাররা তাগাদা করতাছে?

-- হ্যাঁ, স্বপ্নে।

-- ও স্বপ্নে, তাই বলেন।

বুঝছো, ঐটা হইল বাস্তব আর এইটা হইল স্বপ্ন। আবার যখন জাগে, কপালরে, এত অভাব অভিযোগ ভাল লাগে না। স্বপ্নে ২৫ লাখ টাকা পাইছি। রাতের স্বপ্ন তোগো মনে থাকে না অনেকসময়? একটু তো মনে থাকে? তবে? একটু মনে থাকলেই এতবড়ও মনে থাকে।

Science-এর কথা হইল 1 = 'বিরাট, sufficient, অনেক বড়।' এতটুকু sample, যথেষ্ট দিতাছে। Sample দেইখাই তো factory-তে পৌঁছানো যায়।

Mind-টা কি? 'ও' এখানে (বাস্তব জগতে) আইয়া ঐখানটারে স্বপ্ন, আর ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) গিয়া এইখানটারে (বাস্তব জগৎটারে) স্বপ্ন কয়। তাইতো বলছে, মায়ার বাঁধন ছাড়া কি গো যায়। এসব চলছে মায়ার খেলা। কোনটাই ঠিক না। সব মায়ার খেলা। আমি তো দুই জায়গায়ই যাই। স্বপ্নে 'ও' (ভক্তশিষ্য) এইখানে আমারে দেখে। আবার অর ঐ জমিদার বাড়ীতেই আমি গিয়া দেখা কইরা আসি। *একবছর কেন পাঁচবছর আগের কথাও কওন (বলা) যায়। 'ও' (ভক্তশিষ্য) ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) আমার আসন করছে। আমি যাই। ঐখানে আমারে খাওন-টাওন (খাবার দাবার) দেয় টেয়। আমি স্পর্শ কইরা দেই। 'ও' তো ভালই আছে। ভালই দেখতাছে। কি কইছি, বুঝছোস?

এসব চলছে মায়ার খেলা। কোনটাই ঠিক না। সব মায়ার খেলা। আমি তো দুই জায়গায়ই যাই। স্বপ্নে 'ও' (ভক্তশিষ্য) এইখানে আমারে দেখে। আবার অর ঐ জমিদার বাড়ীতেই আমি গিয়া দেখা কইরা আসি।

একটা নতুন subject তোদের জানাইয়া দিলাম। নতুন বিষয়বস্তু। অনেকদিন আগে এই বিষয় নিয়ে বলতাম। আমি যদি বলি, 'তুই কোথায়?' স্বপ্নের মধ্যে রাইখা দিয়া রাজত্ব করাইতেছি। ঐখানে বউ, মেয়ে সব আছে। 'আমার বাচ্চাটা অসুস্থ,' আমারে কয়। কামটাম কি আছে। তাড়াতাড়ি কর গো, তাড়াতাড়ি কর। ডাক্তার আনছে, স্বপ্নে। ওষুধ আনছে। আমার কাছে গেছে। আমার একটা আস্তানা আছে। ঐখানে গেছে। ঐখানে গিয়া আশীর্বাদ নিয়া আইছে, 'বাবা, এই অবস্থা।' আমি কই, ঠিক আছে। বাচ্চাটারে নিয়া আসিস্ তো একদিন।

বাচ্চাটা আমার কাছে নিয়া আইছে। আমি দেইখা থাপড়-টাপড় দিয়া দিছি। ভাল হইয়া গেছে গা। তারপর হাসতে হাসতেই ঘুম ভাইঙ্গা গেছে। হাসিমুখে ঘুম থিকা উঠছে।

-- কিরে, তুই হাসলি কেন? বাবা, মা জিজ্ঞাসা করে। তর কি হইছে?

* শ্রীশ্রীঠাকুর জন্মসিদ্ধ মহান। অণিমা, লঘিমা, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ প্রভৃতি ক্ষমতা জন্মের পূর্ব থেকেই তাঁর করায়ও। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁর নখদর্পণে। সুতরাং একবছর বা পাঁচবছর কেন, জন্মজন্মান্তরের কথা বলাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

ও, হ। 'আবার তোমাগো দেখলাম,' ঘুমের থিকা উইঠা (উঠে) কয়।

ঐখানে (স্বপ্নের জগতে) হইল টাকা পয়সার খেলা। এই লোকজন আইতাছে, যাইতাছে। টেবিল চেয়ারে, কাঁটা চামচের খেলা। বাবুর্চি আইতাছে, খাবার দিতাছে। আর এইখানে (বাস্তব জগতে) ঘুম থিকা উইঠা ভাত সিদ্ধ করতাছে, জমিদার মশাই। জমিদার মশাই, 'ভাতরান্না' করতাছে। আমি যদি ঠিকমত কাম (কাজ) করি, তোমাদের দেখাইয়া দিতে পারি।

অর (ভক্ত শিষ্যের) বিয়ার সম্বন্ধ আইছে। ও বলতাছে, আমি তো বিয়ে করেছি।

-- কন কি মশাই, বউ কোথায়? পাগল হইছেন নাকি?

-- বাবা কয়, কি হইছে রে তোর?

-- বাবা, আমি সত্যি কথা বলছি। আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে। আমার সম্বন্ধ করো না। মহামুস্কিলে পড়ে গেছে বাবা।

কোনটাই ঠিক নাই। এই দুইটার কোনটাই ঠিক নাই। খেয়াল করো। চাবিটা মোচড় দিয়া দেই। স্প্রিং-এর পুতুল দেখছোস্? এক ধরণের স্ক্রু সবারই আছে। চলছে খেলা। মৃত্যু আছে। সেখানে খেলা চলছে। ঐখানে সব চলছে। সবই আছে। এখানে যা আছে, ঐখানে তা আছে। একেবারে এইখানে যা, ঐখানে তা। আবার ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নের জগতে) ঘুম থিকা উইঠা বলতাছে, 'বাবা আমারে বিয়ার জন্য বলতাছে।'

স্প্রিং-এর পুতুল দেখছোস্, এক ধরণের স্ক্রু সবারই আছে। চলছে খেলা। মৃত্যু আছে। সেখানে খেলা চলছে। ঐখানে সব চলছে। সবই আছে। এখানে যা আছে, ঐখানে তা আছে।

-- তোমার বাবা, কোথায় থাকেন?

-- কেন? দিনের রাজত্বে।

-- দিনের রাজত্বে? তুমি যে বিয়ে করেছ, তোমার বাবা জানেন না?

-- আমি বাবাকে বলেছি, আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে। বাবা বলেছেন 'কই?'

-- একদিন বাবাকে এনে দেখিয়ে দাও।

-- তাই করতে হবে। একদিন নিয়ে আসবো। বাবাকে এনে দেখিয়ে দেব।

বাবাকে নিয়ে যাবে ওর বাড়ীতে। ওর বউ বলতাছে, বাবাকে একদিন নিয়ে এসো না?

তখন ছেলে (ভক্তশিষ্য) এসে আমাকে বলছে, 'বাবা আমার বাড়ীতে যাবে। ব্যবস্থা করে দাও।'

পাসপোর্ট লাগে তো, পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। পোলায় গেছে বইলাই বাবা যে যাইতে পারবে, তাতো না। Relation-টা দেখতে হবে তো। যোগাযোগটা দেখতে হবে তো। যোগাযোগ না করলে কেম্নে হইব? যখন পাসপোর্ট, ভিসাটা দিয়া দিমু, তখন বাবাও যাইতে পারবো। বাবারে যাওনের ব্যবস্থা কইরা দিলাম। তখন বাবা দেখতাছে, পোলার (ছেলের), বউ বিরাট ঘরবাড়ী সংসার। তখন বাবা আইয়া কইতাছে, 'হ্যাঁ, পোলা তো বিরাট সংসার পাতাইয়া বইছে।' এটা নিয়ে গল্প লিখলেও ভাল গল্প লেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, স্বপ্নে যদি অন্যায় করে, সেটা কি গণ্য হবে? মানসিক ব্যাপার তো।

-- রোবট যদি খুন করে ফেলে, পাপটা কার হবে? This is a kind of Robat বুঝতে পেরেছ? এখানে (বাস্তব জগতে) অন্যায় করলে spot পড়ে যাবে। কারণ sense আছে। ওখানে তো sense নাই। কিন্তু সবই রোবটের মত, sense-এর মত কাম (কাজ) কইরা যাইতেছে। কিন্তু রোবটের মত পাপ হইতাছে না।

দিনের বেলা বাস্তবে sense-টা আছে। সে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে সবই বলতে পারে। যদি সে বলতে না পারতো, তবে পাপ হইতো না। দিনে ঘুম থিকা উইঠা সে সব ঘটনা বলতাছে। তখনই বুঝবে sense has. দুই জায়গায়ই ঐ sense-টাতো form করতাছে। Sense-টারে down কইরা অপরাধ করতাছে। ঘুমের চোখেও যদি অপরাধ করে, তবে সে বুইঝা শুইনা অপরাধ করতাছে। যদি সে বুঝতে না পারতো, না বুইঝা অপরাধটা করতো, তবে আর কিছু হইত না। দিনের বেলা তুমি যে কাজগুলি করতাছ, ঐগুলি recorded হইতাছে। ঘুমের চোখেও যদি কাজ কর, recorded হবে। কেন তুমি divert করলা? কেন তুমি নিজেকে অন্য পথে চালিত করলা? তখন বুঝটা ঠিক আছে কি না দেখ। তখন বুঝটাও ঠিক আছে। তখন নিজেকে দেখতে পারে, আয়নায় যেমন দেখে।

এখানে (বাস্তব জগতে) অন্যায় করলে spot পড়ে যাবে। কারণ sense আছে। ওখানে তো sense নাই। কিন্তু সবই রোবটের মত, sense-এর মত কাম (কাজ) কইরা যাইতেছে। কিন্তু রোবটের মত পাপ হইতাছে না।

তাহলে বাস্তবে আর স্বপ্নে তুমি যা কিছু করছো, sense-টা যদি থাকে, তোমার অপরাধ হবে। বাস্তবে আর স্বপ্নে এমনিতে কোন তফাৎ নাই। তফাৎটা হল কোথায়? তফাৎটা রাখতে পারতেছে না। স্বপ্নের wife-এর সঙ্গে সঙ্গম করছে, পাত হয়ে গেল গিয়া। শুইয়া আছে পাত হয়ে গেল। কি করে হল?

তাহলে বাস্তবে আর স্বপ্নে তুমি যা কিছু করছো, sense-টা যদি থাকে, তোমার অপরাধ হবে।

-- দেখা গেল, ঐ temparature-এ (টেম্পারেচারে) যখন যায়, ঐ মাত্রায় যখন যায় সঙ্গমে, পাত হয় বীর্য। তাহলে ঐ মাত্রায় গেছে, সঙ্গম

হয়েছে। সঙ্গমের অপরাধটা তোমায় নিতে হবে। তোমার অজান্তে তো কিছু হয় নাই। তোমাকে জানিয়েই পাতটা তোমার হয়েছে। তোমাকে জানিয়েই অর্থাৎ তুমি জেনেই তার সাথে সঙ্গম করেছো।

Dream-টা হইল metre (মাত্রা), তুমি নিজেকে control করতে পেরেছ কি না nature দেখছে। ঐটা হইল খাতা। তোমার নম্বর পাবার খাতা। তুমি পড়াশুনা করছো কি, না করছো, ঐটা হইল metre. Metre-টা দিয়া তুমি জানতে পারবা, কতটা তুমি develop করেছো।

স্বপ্নে তুমি একটা মেয়ের লগে ঘুরলা, বেড়াইলা, রাগারাগি করলা, কত কথা কইলা - এও নাই, কিছু নাই, দেখা গেল পাত হইয়া গেল। তাহলে দেখা গেল, সংযমের অভাব। তোমার Control হয় নাই। এখানে (জাগ্রত world-এও) বীর্যপাত হবে। চিন্তা করলেই বীর্যপাত হয়ে যাবে। অন্য কিছু না। পরিবেশ অনুযায়ীই হবে। এটার চেয়ে শতেক গুণ বেশী হবে।

ঘুমের concentration-টা, ঘুম একটা সমাধি তো। ঘুমের পরে যেটা হবে, এটার চেয়ে সাতহাজার গুণও বেশী হতে পারে। ঐ speed-টা যদি এখানে রাখতে পার, তবেই বাজীমাৎ। ঐটার speed-টা maintain করতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় ঐ speed-টা যদি maintain করতে পার, তাইলেই বাস্ success. যা খুশী তাই করতে পারবে।

Dream-এর ঘটনার উপরে আস্থা নাই। ঘটনা যা খুশী থাক। কিন্তু ঐ metre-টা তোমাকে জানিয়ে দেবে। তুমি যে বাস্তবের বুঝ থিকা বলতাছ, সেইটা বুঝতে পারবা। আয়নায় যে নিজের মুখটা দেখতাছ, সেইরকম। Dream হইল mirror তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে। Nature কখনও ফাঁকি দেয়নি। Nature একেবারে first class training

Dream-এর ঘটনার উপরে আস্থা নাই। ঘটনা যা খুশী থাক। কিন্তু ঐ metre-টা তোমাকে জানিয়ে দেবে। তুমি যে বাস্তবের বুঝ থিকা বলতাছ, সেইটা বুঝতে পারবা। আয়নায় যে নিজের মুখটা দেখতাছ, সেইরকম। Dream হইল mirror তোমাকে সজাগ করে দিচ্ছে।

দেবার জন্য সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। যে যা খুশী বলে বলুক, তোমাকে তৈরী করার জন্য nature first class ব্যবস্থা, সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমাকে পরিষ্কার করার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিছু ধ্বংসও হয় না, সৃষ্টিও হয় না। স্বপ্নে দর্শন তাড়াতাড়ি হয়। স্বপ্নে metre-টা, speed-টা অনেক বেশী। স্বপ্নে তুমি মা কালীর লগে কথা কইতাছ। মা দুর্গার লগে, শিবের লগে কথা কইতাছ। বাস্তবে পারতাছ? যে কথা তুমি তাদের লগে বলতাছ, তাঁরা সত্যদ্রষ্টা, সর্বব্যাপ্তমান।

স্বপ্নে কাজ কইরা অনেকে বাস্তবে পরিষ্কার কইরা ফেলাইছে। স্বপ্নে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়। স্বপ্নে দর্শন তাড়াতাড়ি হয়। যে কথা কইতাছিলাম, স্বপ্নে তুমি মা দুর্গার লগে কথা কইতাছ, শিবের লগে কথা বলতাছ। মা কালীর লগে কথা বলতে আরম্ভ করছো। বাস্তবে পারতাছ? তবে? যে কথা তুমি তাঁদের সঙ্গে বলতাছ, তোমার ধারণা হইল, তাঁরা হইলেন সত্যদ্রষ্টা, তাঁরা হইলেন সর্বব্যাপ্তমান। তার থিকা তোমারই চিন্তাধারা দিয়া, তোমার সত্যরূপকে মূর্তির ভিতর দিয়া তোমারই বিরাটত্বের, তোমারই স্বরূপের কথা পাইতাছ। ভাবতাছ, আমার এখন কি করা উচিত? কি করবো।

বাপ একটা, হইল ছেলে। বাপ - বেটা কথা কইতাছে। তোমারই রক্ত, তোমারই বীর্য; তার সাথে তুমি কথা কইতাছ। তোমারই সত্য মূর্তি, তোমারই সৃষ্টি, আলাদা নাম হইয়া গেল দেবতা। তুমি তার সাথে কথা কইতাছ।

-- আমার কি করা উচিত বাবা?
তুমি হাতজোড় কইরা কথা কইতাছ।

-- তোমার? তুমি একটা কাজ কর।
তুমি অমুক একটা জায়গায় গিয়ে দেখ, সেখানে একটা পোড়ো বাড়ী রয়েছে। এই পোড়ো বাড়ীটা যেখানে, সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে মথুরা। তুমি মথুরার অমুক জায়গায় গিয়ে দেখবে, একটা পোড়ো মন্দির আছে।

সেখানে সাধারণতঃ কেউ যায় না। সেখানে ছোট একটা পাথরের মূর্তি আছে। বহু সাধু সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে সাধনা করেছে। তুমি সেখানে সাতদিন বসে জপ কর। আমি তোমাকে দর্শন দেব।

এতসব স্বপ্নে গেল। এইবার তুমি জাগলা। জেগে মাথায় হাত দিয়ে বসলা। আমি এখন কি করি? মথুরায় জঙ্গলে ঐ পোড়ো বাড়ী। নাম জানি না, কিছু না। আমি গ্রামের পর গ্রাম তছনছ করে খুঁজে বার করবো সেই পোড়ো বাড়ী। মথুরায় গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে দেখে, পড়ে আছে একটা ভাঙ্গাচুরা বাড়ী। গিয়া দেখে কিছু নাই। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। বাড়ীটা ভাঙা -- আরজিনা সাপ, ব্যাঙ ডাকে চারিদিকে। এগিয়ে চলবো আমি, মনে মনে বলে। গিয়ে দেখে, একটা মুর্তি।

-- হে প্রভু, তোমার বাক্য মিথ্যা হয় না। তুমিই সত্য, তুমিই সত্য প্রভু। আমি সাতদিন এখানে বসে দিবারাত্র জপ করবো। কোন ভয়ভীতি আমার নাই, এই গভীর বনে। সে বসে গেল জপ করতে। ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ।

হে প্রভু, তোমার বাক্য মিথ্যা হয় না। তুমিই সত্য, তুমিই সত্য প্রভু। আমি সাতদিন এখানে বসে দিবারাত্র জপ করবো। কোন ভয়ভীতি আমার নাই, এই গভীর বনে। সে বসে গেল জপ করতে। ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ।

রাত্রি ২টা, আড়াইটার সময় 'ফোঁস ফোঁস, ঘোঁস ঘোঁস', কোন ভয় পাব না। যা আসে আসুক, মৃত্যু যখন আছে। আমি তাঁর আদেশ পালন করবোই। আসুক ভয়ভীতি, ভয় পাই না। পাঁচদিন চলে গেল, আজ ছয়দিন। ছয়দিন আট ঘন্টা হ'ল। হঠাৎ দেখা যাচ্ছে, মূর্তির ভিতর একটা আলো এসে ঝলকানি দিল। একজন সামনে এসে দাঁড়াল; দাঁড়ি আছে, শিবের মূর্তি।

-- আমি এই রূপেই তো তোমাকে দেখেছি, বাবা।

-- হ্যাঁ, আমি খুশী হয়েছি, তোর নিষ্ঠা ও সাধনা দেখে। বল, কি চাই।

-- আমি কিছু চাই না। তোমার চাওয়াই আমার চাওয়া। তুমিই আমাকে গড়ে নেবে তোমার ইচ্ছামত। আমি চাইলে আমার ভুল হতে পারে। আমার চাওয়া ভুল হতে পারে। তুমি আমাকে তোমার মনের মত করে গড়ে নাও।

-- আমি আশীর্বাদ করছি। তুই কালই আমাকে দেখবি। তোর ইচ্ছা সফল হবে। তুই এইভাবেই কাজ করে যা। তুই বাড়ীতে চলে যা। বাড়ীতে গিয়ে সাধনার একটা কুটীর কর। ঐ কুটীরে বসে তুই জপ কর।

-- তাই যেন হয় বাবা, তাই যেন হয়। তোমার নির্দেশ মাথায় নিয়ে আমি যেন সেইভাবেই চলতে পারি। হে স্বয়ং শম্ভুনাথ। প্রণাম করলো। তারপর চলে আসলো। ঐ যে গড়ে গেল ভিতটা, আর নষ্ট হবে না। ঐ যে খুঁজে পেল, গেঁথে গেল মনে। ঐ যে চিহ্ন দিয়ে দিল, তাতেই কাজ হয়ে' গেল। তোমরা ঠিকানা দাও না? জোড়া মন্দিরের কাছে, সিনেমা হলের কাছে?

পাথরের পূজা কর, আমি বলতাছি না। ঐ যে স্বপ্নে যেটা বলে দিল, জাগ্রত অবস্থায় সেটাকে দেখবার জন্য সে বেড়িয়ে গেল। গিয়ে তো ঐটা পেল। পেয়ে তার মনে গভীরতা, আবেগ এসে গেল। আবেগটা এমন আসলো, স্বপ্নে যেটা হয়েছে, জাগ্রতে সেটা হয়ে গেল।

পাথরের পূজা কর, আমি বলতাছি না। ঐ যে স্বপ্নে যেটা বলে দিল, জাগ্রত অবস্থায় সেটাকে দেখবার জন্য সে বেড়িয়ে গেল। গিয়ে তো ঐটা পেল। পেয়ে তার মনে গভীরতা, আবেগ এসে গেল। আবেগটা এমন আসলো, স্বপ্নে যেটা হয়েছে, জাগ্রতে সেটা হয়ে গেল।

স্বপ্ন জাগ্রত যখন সমান হয়ে যাবে, তখনই তোমার কাজ successful হবে। স্বপ্নের ঘটনাগুলোর দাম দেব না, স্বপ্নের যে speed-টা, ঐ speed-টা যদি বাস্তবে আনতে পার, তাইলে success, আর কোন কথা নাই। চক্ষের সামনে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে।

এখানে আইসা love কুড়াইলা; প্রেম করলা। আজে বাজে কুড়াইয়া যদি নিয়া যাইতে হয়, এর চেয়ে sad (দুঃখের) আর কিছু নাই। তারজন্যই temporary death. Death-টা দিয়া দিছে সেইজন্য। এই period-এর মধ্যে যা কাজ তুমি করে নাও। ট্রেন ছাড়বে ৫ টায়। এর মধ্যে কাজ সারতে যদি না পার, সাড়ে চারটার সময় তুমি যদি এইখানে জামাকাপড় পরতে থাক, তবে তুমি train miss করবে।

রাস্তা পরিষ্কার। Green signal, green সবাই দেখে। রাস্তা দেখতাছো পরিষ্কার। সবসময় উত্তরমুখী কাঁটায় চলতে হবে। যদি অন্য দিকে সময় নষ্ট না কর, একভাবে কাঁটায় কাঁটায় যাও; মনে মনে স্থির কর, 'না, আমি অন্য কোনদিকে যাব না, আমাকে north-এ আসতে হবে', এইভাবে যদি চল, তবে ঐ কাঁটাই তোমাকে নিয়া যাবে। কাঁটা ঠিক উত্তরে কাঁটায় কাঁটায়, কাঁটায় কাঁটায় চলছে। আমি চলছি, জীবনে যাত্রার পথে চলছি। এই পেন্ডুলাম চলছে। এখনও সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারমধ্যে যদি সতর্কতা না নিই, সাবধান না হই, শুধু হাসিখুশী, মিথ্যা, ছলচাতুরী, নানারকম নিয়া যদি আমি দিন কাটাই, তাহলেই তো আমার এতবড় natural gift অপচয় করা হবে। বাবার দেওয়া টাকা অপচয় করলা। কাজেই একমাত্র কাজ আদেশ আর নির্দেশ পালন। বলবো কি, আমি অজস্র গভীর তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারবো। পাইয়ে তো দিতে পারবো না। একদম practical কথা। আমি টাকার সন্ধান দিতে পারি। টাকার মালিক তো না। Cashier মালিক না। কিন্তু Cashier যা টাকা গোণে, দেখা গেল পৃথিবীর মধ্যে যত ধনী আছে, তারচেয়ে বেশী টাকা সে নাড়াচাড়া করেছে। বুঝছো তো? পঞ্চাশটা বছর সে এইকাম (কাজ) কইরা গেছে। অরে (ওকে) যদি জিজ্ঞাসা কর, তুমি কতটাকা নাড়ছো? সে বলবে, আমার গোণা সবটাকা যদি একজনে পায়, সে পৃথিবীর সম্রাট হয়ে যাবে। আদতে কিন্তু পঞ্চাশ টাকার চাকরি।

তাই তোমার যে বস্তু ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে, সেটা অপচয় করবে না। সেটা অপচয় করলে দুঃখের আর অন্ত থাকবে না। Capital-টা ঠিক

রাইখো। Capital-টা ঠিক রাখতে হবে। Capital-এ হাত দিবা না। বেহুঁশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি। তাই, আগে যেয়ে শিখে নাওরে গুরুর কাছে দোকানদারি। বুঝতে পেরেছ?

বেহুঁশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি। যাইহোক, ঠাকুর পাইছিলা তোমরা। যাইহোক, এই ঠাকুর, কোনমতে ঠাকুর একটা। এই ঠাকুর মালিক না। কোনকিছুর মালিক আমি না। কিন্তু দরজাটা খোলা আছে। ব্যাঙ্কের টাকা, মানুষকে দিয়া দিতাছে। তারাই তো দেয়। তারা মানুষ। আমি বিশ্ব ব্যাঙ্কের cheque কোথায় থাকে, ঠিকানাটা তোমাদের দিয়া দিতে পারি। কি করবো আর? cashier-ও জানে না, manager-ও জানে না। এটা জানানোর কেউ নাই। সন্ধান দেওনের লোক কোথায়? লোক নাই। জানেই না কিছু। সন্ধান দেবার কেউ নাই।

তাই তোমার যে বস্তু ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে, সেটা অপচয় করবে না। সেটা অপচয় করবে না। সেটা অপচয় করলে দুঃখের আর অন্ত থাকবে না। Capital-টা ঠিক রাইখো। Capital-টা ঠিক রাখতে হবে। Capital-এ হাত দিবা না। বেহুঁশভাবে চললে পরে তহবিলের মাল যাবে চুরি তাই, আগে খেয়ে শিখে নাওরে গুরর কাছে দোকানদারি। বুঝতে পেরেছে?

প্রকৃতির দান, সেইটা যেদিন পরপর পরপর বুঝতে পারবে, দেখবে মাত্রামতন সব আছে। আঙুল দিয়া মধু নিলে বুঝা যায় না? ঠিক বুঝতে পারবে, ফাঁদটা কোথায়?

এত সুন্দর জিনিস। যতই দূরে ফেলে দিক রাগে অভিমানে, কিন্তু পুরোপুরি বিজ্ঞান। কেউ গ্রহণ না করে পারবে না। কত সুন্দর। অফুরন্ত ভান্ডার থেকে তোমাদের দিতে পারতাম। যা দিলে তোমার হবে, সেটা আমি দিতে পারি। সেটা যদি অপচয় কর, তবে তুমি তোমার natural gift অপচয় করলে। সেখানে আমার হাত দেবার নিয়ম নাই। 'বাবা, আমার mind-টা ঘুরাইয়া দাও', একথা যদি বল, সেইটা নিয়ম নাই। Mind-টা ঘুরানো যাবে না। যেটা দেবো, সেটাই তো ঘুরাবার জন্য।

'বাবা, আমার mind-টা ঘুরাইয়া দাও', একথা যদি বল, সেইটা নিয়ম নাই। Mind-টা ঘুরানো যাবে না। যেটা দেবো, সেটাই তো ঘুরাবার জন্য।

বাবায় কইলো, দেখরে, তুই তো কিছু করোস্, না। তোরে আমি ৫০ হাজার টাকা দিলাম। তুই কইরা কাইটা খা।' তারপরের দিনই বোতল লইয়া যা যা তেরে তেরে হ্যাঁ ইয়া শুরু হইয়া গেল গিয়া। পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে দেখা গেল, পাঁচ হাজার টাকা আছে।

-- এ্যাঁ? পাঁচ হাজার টাকা?

বাবার কাছে কি জবাব দেব? বাবাতো জানে, পোলায় ব্যবসা করতাছে। এদিকে তো পাঁচ হাজার টাকা হয়ে গেল।

আমি তোমাকে এনে দিতে পারবো। নাড়াচাড়াটা তোমার। Will করে দিছে তো। ঐটা gift. সেখানে আমার হাত দেবার কিছু নাই। অনেকে ঐটা পেয়ে গেছে তো। অনেক চোর, অনেক ডাকাত, অনেক নেশাখোর change হয়ে গেছে। কারণ ভরপুর হয়ে গেছে তো। দিয়া দিছি ভরপুর কইরা, তাই change হয়ে গেছে। 'আমার তো অনেক আছে,' তারা ভাবছে। তাই চুরি বন্ধ হয়ে গেছে। তোমার বাড়ীতে অনেক জিনিস আছে। তাই চুরি করার তো দরকার নাই। চুরি বন্ধ হয়ে গেছে seed-টা তো রয়ে গেছে। বুঝটাতো রয়ে গেছে। sense-টা তো রয়ে গেছে। খারাপ কাজ করার সময়ে another way, তোমার sense-টা যদি কার্যকরী না হতো, তবে nature responsible হতো। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে ওয়াকিবহাল হয়ে আছে। তুমি যা কিছু করতাছ, না জেনে করছো না। জেনেই করছো, বুঝেই করছো। সেজন্য সেখানে কেউ হাত দেবে না। আমার বুঝটাকে যাতে বুঝের মাত্রায় রেখে চলতে পারি, এইজন্যই সাধনা। এটাই natural gift.

তুমি যা কিছু করতাছ, না জেনে করছো না। জেনেই করছো, বুঝেই করছো। সেজন্য সেখানে কেউ হাত দেবে না। আমার বুঝটাকে যাতে বুঝের মাত্রায় রেখে চলতে পারি, এইজন্যই সাধনা। এটাই natural gift.

স্টিয়ারিং আমার হাতে। গাড়ীটাকে ইচ্ছে করে গাড্ডায় ফেলে দেওয়া যায়। তাতে নিজেও মরবে, গাড়ীতে যারা আছে, তারাও মরবে। আবার ভালভাবে নিয়েও যাওয়া যায়। খুব সহজ, আবার খুব কঠিন।

গাভীর থেকে দুধ। দুধ মন্থনে মাখন। ঘাস বলতাছে, আমার ঐ (দুধের) চেহারা।

মাখন বলছে, ঐ যে মানুষ মাড়িয়ে যায়, (ঘাস), ঐটা আমার চেহারা। ঐ থেকে কিন্তু আমার সৃষ্টি।

একটা দুধের মধ্যে কতগুলি ছাঁকনি থাকে জানিস্? অনেকগুলি ছাঁকনি থাকে। তবে আসে দুধ। এই দেখেও তো অবাক হয়ে যাওয়া উচিত। এই সৃষ্টি তত্ত্বের রহস্যে তুমি (স্রষ্টা) কে, তা জানি না। তুমি কোথায় আছ, তা জানি না। তোমার সৃষ্ট বস্তু দেখে আমি অভিভুত, এরকম কারিগরী, এরকম কারুকার্য, কি করে সম্ভব? এর পিছনে একজন অতি সচেতনওয়ালা না থাকলে এত সুন্দর এই বিষয়বস্তুর এত সুন্দর সুশৃঙ্খলধারা কি করে আসে? আপনা আপনি কি সাজানো হয়? সাজাতে কি পারে? এত সুন্দর ছাঁকনি কি করে আসে? হার্ট এইভাবে চলছে, অদ্ভুত। সমস্ত নার্ভ চলছে। ফুস্‌ফুস্ চলছে। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের link. এই drop-টা পড়লে, ঐ drop-টা পড়ছে। দুটো drop আলাদা পড়লে দু'রকম হয়ে যাবে। একটা drop পড়লো, ঐ drop টা পড়লে আরেকটা drop পড়বে। আবার ঐ drop পড়লে আরেকটা drop পড়বে। অদ্ভুত mechanism. অদ্ভুত কারিগরী বিদ্যা। কে এর পিছনে রয়েছে? তিনি অদ্ভুত সচেতনওয়ালা। তিনি আমাদের ডাক শেখাচ্ছেন। Nature আমাদের ডাক শেখাচ্ছে।

-- তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন না?

-- আমি তোমকে ডাকলে তুমি সাড়া দাও, তুমি ডাকলে আমি সাড়া দিই, আর তিনি স্রষ্টা, তিনি nature, আমরা ডাকলে, কাতরভাবে প্রার্থনা জানালে, আবেদন করলে নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। তাঁর সাথে সাথে কাঁটায় কাঁটায় আমি যদি চলি, তিনি নিশ্চয়ই বিমুখ হবেন না। আমার থেকে সরে থাকবেন না।

আমি তোমকে ডাকলে তুমি সাড়া দাও, তুমি ডাকলে আমি সাড়া দিই, আর তিনি স্রষ্টা, তিনি nature, আমরা ডাকলে, কাতরভাবে প্রার্থনা জানালে, আবেদন করলে নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।

কি আর করবি। আমারে দিয়া কোন কাজ তো করাইতে পারবি না। শুধু সংসার আর ঝগড়া বিবাদ, মান-অভিমান ভাঙাতে ভাঙাতে সময়

কি আর করবি। আমারে দিয়া কোন কাজ তো করাইতে পারবি না। শুধু সংসার আর ঝগড়া বিবাদ, মান-অভিমান ভাঙাতে ভাঙাতে সময় শেষ। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, শালগ্রাম শিলা দিয়া বাটনা বাটায়। শালগ্রাম শিলা দিয়া বাটনা বাটাইতেছে।

শেষ। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, শালগ্রাম শিলা দিয়া বাটনা বাটায়। শালগ্রাম শিলা দিয়া বাটনা বাটাইতেছে। আমাকে যদি সত্যিকারের কাছে লাগাইতে পারতি, তাইলে দেখতে পারতি, কত মধুময় জিনিস পড়ে রয়েছে। কত অমূল্য জিনিস রয়েছে যে, চিন্তা করতি, ওগুলো না জেনে আমরা করছি কি। এখন আর সময় নাই। ব্যাধিতে আক্রমণ করে ফেলেছে। আমি যা জানাই, এরচেয়ে সহজভাবে আর জানানো যায় না। এত সহজ সরলভাবে কত গভীরতত্ত্বকে আমি প্রকাশ করি। ঐ প্রকাশ আর কে করেছেন জানি না। অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব, পুরোপুরি বাস্তবভিত্তিক কথা। বাস্তবের বাইরে একটি কথা আমি বলি না। কোন কল্পনার কথা বলি না। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক কথা। আপনিই তোমাকে জানিয়ে দেবে, জাগিয়ে দেবে -- কোথায় দেবতা বা কোথায় স্রষ্টা? কোথায় আত্মা? কোথায় বিবরণ? কোথায় ছিলাম? কোথায় যাব? সব জানিয়ে দেবে। দিবালোকের মত সামনে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে।

জীবনের অবসানের পথে চলছো সবাই। ছুটে চলছো -- যাচ্ছ কোথায়? শ্মশানে। তিল তিল করে এগিয়ে চলেছো। আজ এখানে আছে (কোন ব্যক্তি)। কালকেই দেখলে নাই। কোন ঠিক নাই। কোন ঠিক নাই। **হরদম দেখতে পাচ্ছ না, হার্ট এ্যাটাক, করোনারী, সেরিব্রাল, সব চলছে চারিদিকে। তারমধ্যে পড়ে গেছি। এ লাইনে পড়ে গেছি। কিন্তু জানি না, আমার অভাবটা হলে তোমরা বুঝতে পারবে, আমাদের কত কিছু জানার ছিল। আমরা অবহেলায় সব নষ্ট করেছি। যে জিনিস দেবার ছিল আমার, যে জিনিস ঢেলে সাজিয়ে দেওয়া যেত, সেদিক থেকে আমাকে বঞ্চিত করে রেখেছে।** মেঘ সূর্যকে আড়াল

হরদম দেখতে পাচ্ছ না, হার্ট এ্যাটাক, করোনারী, সেরিব্রাল, সব চলছে চারিদিকে। তারমধ্যে পড়ে গেছি। এ লাইনে পড়ে গেছি। কিন্তু জানি না, আমার অভাবটা হলে তোমরা বুঝতে পারবে, আমাদের কত কিছু জানার ছিল। আমরা অবহেলায় সব নষ্ট করেছি।

দিয়ে রেখেছে। তোমাদের এই কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে আমাকে তোমরা আড়াল দিয়ে রেখেছ, আবরণ দিয়ে রেখেছ। কিছুতেই আমি তোমাদের কাছে আসতে পারছি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, মেঘ কিন্তু সূর্যেরই সৃষ্টি। মেঘ সূর্যেরই সৃষ্টি। মেঘ কোনদিনই সূর্যকে আটকে রাখতে পারে না। কোন কিছু দিয়েই সূর্যকে আবরণ দিয়ে রাখতে পারে না। তবুতো আবরণ হচ্ছে। কেন আবরণ হচ্ছে? এইরকম কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ তোমাদের ঘিরে রাখছ চারিদিকে, যাতে আমাকে আর দেখতে না পার। আমাকে আড়াল করে রাখছ তোমাদের কুয়াশায়। তোমাদের আচ্ছন্নে (অজ্ঞানতায়) আমাকে আবৃত করে রেখেছ, আড়াল করে রেখেছ।

সূর্যদেব কি সুন্দর। কোথায় মেঘ আর কতদূরে সূর্য। এমনি অবস্থা আরকি। শুধু দেখছি, তোমাদের কতবড় ত্রুটি চলছে, আমার natural gift থিকা আমাকে পর্যন্ত আড়াল করে রাখতে চাও। ছাতি দিয়া রাখছো। কথার কথা বলছি, ছাতি দিয়া যেন সূর্যরে আটকাইয়া রাখছো। কথার কথা বলছি, তেজের লইগা (জন্য) কর, রৌদ্রের লইগা কর আর তাপের লইগা কর, আড়াল তো দিয়েছ আমাকে। চলতে সক্ষম হয় না অনেকে। Metre-এর আইনে কেউ সক্ষম হয় না। আমি চেষ্টা করি বলেই এত ছিদ্যৎ।

প্রকৃতি তোমাকে জানার জন্য বুঝটা দিয়েছে। আলোও আছে। সব বিষয়বস্তু প্রকৃতি ঢেলে দিয়েছে, will করে দিয়েছে। প্রকৃতি বলছে, 'I am giving you this, this and this. এখন তুমি right way তে চলো। I want it.' প্রত্যেকের পক্ষেই সঠিক পথে চলা সম্ভব। প্রকৃতি তার নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে পারে না তো, কিছু করতে পারে না তো, মাঝে মাঝে Force কইরা ফেলায়।

যদি আগুণ জ্বালাও, একটা মশাল ধরাও, এ কুয়াশা সরে যাবে। মশাল যদি ধরাও, অন্ধকার কেটে যাবে, কুয়াশা আর থাকবে না। প্রত্যেকের ভিতরেই sense আছে। কাঠিটা হতে, দেশলাইটা এইখানে। সংযোগ করলে তো জ্বলবে। তুমি যদি সংযোগ না কর, এমনি ধরে বসে থাক, কোনদিনই

যদি আগুণ জ্বালাও, কেটা মশাল ধরাও, এ কুয়াশা সরে যাবে। মশাল যদি ধরাও, অন্ধকার কেটে যাবে, কুয়াশা আর থাকবে না। প্রত্যেকের ভিতরেই sense আছে। কাঠিটা হতে, দেশলাইটা এইখানে। সংযোগ না কর, এমনি ধরে বসে থাক, কোনদিনই জ্বলবে না।

জ্বলবে না। আর যদি দুইটা ধরে বল, 'তুই আয়, তুই আয়,' সংযোগ হল দুইটার। ছ্যাৎ করে জ্বলে উঠলো। দেশলাই তোমার হাতে, কাঠিটাও তোমার হাতে। কাঠিটা যদি ফেলে দাও, শুধু দেশলাই-এর বাক্সটা ধইরা বইসা, থাইকা লাভ কি? আবার বাক্সটা ফেলাইয়া দিলা, কাঠিটা লইয়া বইসা রইলা। তাতেই বা লাভটা কি? সব বারুদ-টারুদ সব তৈরী করা আছে তোমার মধ্যে। Nature তোমাকে এতটুকু ফাঁকি দেবে না। Nature তোমাকে যে sense-টা দিয়ে দিয়েছে, সেই sense-এর মাধ্যমে তোমার কার্যকলাপ, তুমি যা করছো, সেটা বুঝতে পারছো কি না সেইটা দেখবে, তাইলেই যথেষ্ট। একটাতেই হয়ে গেল। আর কিছু দেখার নাই। শুধু তুমি যা কিছু করছো, বুঝে করছো কিনা, তুমি বল।

তুমি মনে মনে বলছো, 'তাইতো সবই আমি বুঝি। যা কিছু করছি, সবতো আমি বুঝেই করছি।' তাইলে আর অন্যরে দোষারোপ কইরা লাভটা কি? এতটুকু বাচ্চা (শিশু) যদি ঢিল মারে বা কোন কিছু ছুঁড়ে মারে, তাতে যদি wounded হয়ে কেউ মারা যায়, বাচ্চার punishment হবে না। কারণ তার (বাচ্চার) sense-টা আছে। sense-টা blossom হয় নাই। গোলাপ গাছ আছে, কলিটাও (কুঁড়িটাও) হইছে। কিন্তু ফোটে নাই। তারপরে তো গন্ধ। তুমি যা করতাছ, জাইনাই (জেনেই) করতাছ। sense হলে, sense থাকলে, বুঝবাই (বুঝবেই)। না বুইঝা করলে অপরাধ নাই। পৃথিবীতে যে যা কিছু ত্রুটি করতাছে, সব বুঝতাছে, বুইঝাই করতাছে। গরু, শিয়াল থিকা আরম্ভ কইরা প্রতিটি প্রাণী সব বুঝতাছে। ভুল যদি হয় জেনেশুনে, সেই ভুলের মাশুল তো দিতেই হয়। পিঁপড়া পাড়াইয়া যাইতেছ। তোমার চোখে পিঁপড়া নাও পরতে পারে, তাই পায়ের খাঁজটা দেখছো তো। এই পায়ের খাঁজেই বেশীরভাগ পিঁপড়া আটকে যায়। মরে না, বেঁচে যায়। সুতরাং বাঁচাবার

পৃথিবীতে যে যা কিছু ত্রুটি করতাছে, সব বুঝতাছে, বুইঝাই করতাছে। গরু, শিয়াল থিকা আরম্ভ কইরা প্রতিটি প্রাণী সব বুঝতাছে। ভুল যদি হয় জেনেশুনে, সেই ভুলের মাশুল তো দিতেই হয়।

Sense যতক্ষণ তোমার body-তে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বুঝতে পারতাছ, ততক্ষণ তোমার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য তুমি দায়ী।

জন্য nature safety - guard দিয়া দিছে। সব জায়গায় safety - guard নাকে মুখে বাতাস ঢুকতে পারে, ধুলা ঢুকতে পারে, তারজন্য safety - guard দেখ না কি অদ্ভুত। কবে পৃথিবীতে আগুণ লাগলো, আগুণের গোলা, ধোঁয়া হইব, আগেই তৈরী করা সব। ভ্রু-র খাঁজে খাঁজে ধুলা, জল আটকে থাকে; যাতে চোখে সরাসরি না পড়তে পারে, তারজন্য এই safety - guard. সত্যি, চিন্তা করেছো কখনও? জলটা এদিক দিয়ে না পড়ে ওদিক দিয়ে যায়। ঘামটা পড়বে তো ওদিক দিয়া। কিন্তু চোখে পড়বে না। এদিক থেকে এসে ওদিকে গিয়ে পড়বে। অদ্ভুত। এই বুঝটা যখন nature থিকা দিয়া দিছে, তখন তোমার ত্রুটির জন্য nature দায়ী হতে পারে না। তোমার কি হতে পারে, শরীর থিকা ঘাম বেরোতে পারে, nature সব ওয়াকিবহাল। ওয়াকিবহাল আছে বলেই এই খাঁজ কাটা, ঐ খাঁজ কাটা, ঐ খাঁজ কাটা, এই খাঁজ কাটা ইত্যাদি। Sense-এর কি setting - কি সুন্দর setting কি অদ্ভুত। এত safety - guard থাকা সত্ত্বেও তো চাপা মরে অনেকে মরে। Sense যতক্ষণ তোমার body-তে আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বুঝতে পারতাছ, ততক্ষণ তোমার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য তুমি দায়ী।

-- তুমি বুঝতে পারছো কি না?

-- যদি বুঝতে না পারো, তাইলে বলার কিছু নাই। এর মধ্যে আর কোন কথাই বলা চলবে না। কোন কথা বলা চলে না। কি ভুল, কি শুদ্ধ পরবর্ত্তী কথা, তুমি বুঝছো কি না, ব্যাস্।

কামটা (কাজ) গোপনে করছো কি না? তবে? কামটা (কাজ) open করতে পারতাছ না। Murder-টা যদি খুশীচিত্তে openly করতে পারতা, তাইলে হইত। তুমি খুশীচিত্তে murder করতে পার নাই। এক যুদ্ধের সময় এও মনে হয়, গোপনে মারতাছি লোকগুলিরে উপায় নাই। এই চলছে।

শূন্যেরও শেষ নাই, সৃষ্টিরও শেষ নাই। এতবড় জায়গা শূন্য, যত সৃষ্টিই করুক, 'ও' (শূন্য) স্থান দিতে পারবে। শূন্যের শেষ পায় নাই। এই যে চলছে কোটি কোটি বছর, শূন্যের শেষ পাইতেছে না। আমরা তো ভ্রমণে চলছি। Plane এ চলছি। Plane-এর মধ্যে (পৃথিবীর মধ্যে) চলছি সব। একই জায়গায় বসে আছি। বড় Plane-এ (পৃথিবীতে) চলছো। সেখানে কোয়ার্টার আছে, বাথরুমও আছে। চলছো, চলছো শূন্যে। আরে বাবা। কি গতিতে যে চলছে শূন্যে। হাজার হাজার কোটি কোটি বছর চলছে, ফাঁকা জায়গায়। একটা জায়গায়ও কেউ গুঁতা খাইতেছে না। সৃষ্টিও সেইরকম চলছে। পরপর পরপর হইতাছে, হইয়াই চলছে। এক সময় ছিলই না। ছিল ছিল সব ছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে সব ছিল। গাছগুলি না দেখতে পার, বীজগুলি তো পড়ে আছে। গাছ না পেলেও বীজগুলি তো পেল। বীজগুলি তো গাছই। মানুষ না থাকলেও প্রাণী তো ছিল।

মানুষ হিসাবে কোন কথা না। প্রাণী জগতের, সৃষ্ট বস্তুর বিষয়বস্তু গুলো এই পৃথিবীর বুকে ছিল। সেগুলো আলো, বাতাসে থেকে কোনদিন ফুটে বার হয়েছে। খই ভাজা দেখছো তো? ফুট্‌ফাট্ ফুট্‌ফাট্ সুন্দর খই ভেজে বার হচ্ছে। আনলাম ধান, হল খই। কত শুনবি। আমাকে যদি পঞ্চাশ বছর রাইখা দেস (দিস) বসাইয়া, এই পঞ্চাশ বছরই বলতে পারবো। একটানা পঞ্চাশ বছর ২৪ ঘন্টা কইরা বলতে পারবো।

মানুষ হিসাবে কোন কথা না। প্রাণী জগতের, সৃষ্ট বস্তুর বিষয়বস্তু গুলো এই পৃথিবীর বুকে ছিল। সেগুলো আলো, বাতাসে থেকে কোনদিন ফুটে বার হয়েছে। খই ভাজা দেখছো তো? ফুট্‌ফাট্ ফুট্‌ফাট্ সুন্দর খই ভেজে বার হচ্ছে। আনলাম ধান, হল খই।

দুধ পাইতে গেলে আজ গাভী কিনা হাইল (হাল) ছাইড়া দিলে তো হইব না। গাভী আনতে গেলে গোয়ালঘর করতে হইব, খাদ্য যোগাড় করতে হইব, তারপরে দোহাইয়া দিব, তবে পাইবা দুধ। সেজন্য একটি কথা। তুমি খাইবা দুধ। তুমি যখন দুধ খাইবা, দুধ কিনা নিয়া আস। তুমি শুনবা আদেশ। এত details বইলা দিয়া আদেশ দিলে তো মুস্কিল।

-- এই জায়গাটা কার?

-- সরকারের। এক কথায় হইয়া গেল।

-- এই জায়গাটা কার?

-- তুমি যদি বলতে থাক, চৌকিদার, কনষ্টেব্‌ল, সাব-ইন্সপেক্টর, A.C., D.C., O.C., Assist. Commissioner, Commissioner ইত্যাদি। এইভাবে চৌকিদার থিকা প্রেসিডেন্ট অবধি যদি মুখস্থ কইরা বলতে হয় সব, প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগবে। তাই একটা কথাই সরকার। ব্যাস্।

"রাম নারায়ণ রাম"

বিরল নির্বিকল্প সমাধি

(১৯৬০)

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে 'বেদান্তদর্শন' এবং 'যোগদর্শন' উভয়দর্শনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠদর্শন। আবার 'বেদান্তদর্শন' এবং 'যোগদর্শন' বা 'পাতঞ্জল দর্শনের' মধ্যে সমাধি পর্বটি সাধনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগসাধনার চরমতম পর্যায়ে উন্নীত হলে সাধক যে স্তরে পৌঁছান, সেটি হ'ল নির্বিকল্প সমাধি। এই নির্বিকল্প সমাধি স্তরে পৌঁছাতে হলে সাধককে শমদমাদিসাধনসম্পৎ, প্রাণায়াম, রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি সাধনার দুরূহ স্তরগুলি আয়ত্ত করে, অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়।

বিভিন্ন শাস্ত্রে, পুঁথিকে দার্শনিকগণ সমাধি সম্পর্কে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বেশীরভাগ বিবরণের মাধ্যমে সমাধির প্রকৃত তত্ত্ব, সমাধির প্রকৃত তাৎপর্য সহজভাবে উপলব্ধি করা যায় না। মানচিত্র পাঠ করলেই যেমন দেশভ্রমণ হয় না, তেমনি সাধনায় ব্রতী না হলে, যোগসাধনার মাঝে নিবিষ্টচিত্তে আত্মনিয়োগ না করলে সাধনার প্রকৃত অবস্থাটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বেশীরভাগ সাধক যোগী ঋষিরা প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক ইত্যাদি যোগ দ্বারা একটা মাত্রা পর্যন্ত নিজেদের নিয়ে যান। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি যে মাত্রায় হয়, সেই মাত্রায় দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বা কাজ (যে উদ্দেশ্যে নির্বিকল্প সমাধি) সম্পন্ন করে দেহে প্রবেশ করা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাদের

দ্বারা সম্ভব হয় না। 'বেদান্তদর্শন'*১ এবং 'পাতঞ্জল দর্শনে'*২ সবিকল্প সমাধি' ও 'নির্বিকল্প সমাধি' সম্পর্কে যাহা জানা যায়, উচ্চকোটির সাধক ছাড়া তার তাৎপর্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।

*১ সমাধি দ্বিবিধঃ সবিকল্পকঃ নির্বিকল্পকশ্চেতি। তত্র সবিকল্পকঃ নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি বিকল্পলয়ানপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্। তদা মৃণ্ময়গজাদিভানেহপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেহপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে।

বেদান্তদর্শনে সমাধি দুই প্রকার। সবিকল্পক সমাধি এবং নির্বিকল্পক সমাধি।

সবিকল্পক সমাধি -- যখন জ্ঞাতা (যিনি জানেন) জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর বিভেদ প্রতীতি হলেও (সাধকের) চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আকারে আকারিত হয়ে অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মে ব্যাপ্তমান হয়ে সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই অবস্থান করে, তখন চিত্তের সেই অবস্থাকে সবিকল্পক সমাধি বলে। যেমন মৃত্তিকা নির্মিত হস্তী প্রভৃতি দেখলেও তার উপাদান মৃত্তিকারই প্রতীতি হয়, সেরূপ সবিকল্পক সমাধিতে জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি দ্বৈতবস্তুর প্রতীতি হলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রকাশিত হন।

নির্বিকল্পকস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাম্ একীভাবেন অবস্থানম্। তদা তু জলাকারাকারিতলবণানবভাসেন জলমাত্রাবভাসবৎ অদ্বিতীয়বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেন অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রম্ অবভাসতে।

নির্বিকল্প সমাধি -- যখন জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের কোন বিভেদ থাকে না, সাধকের চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আকারে আকারিত হয়ে তাতেই (অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই) একভাবে অবস্থান করে, মনের এই বিশেষ অবস্থাকে বলে নির্বিকল্প সমাধি। যেমন জলে লবণ মেশানো হলে লবণকে আর পৃথকভাবে দেখানো যায় না; জলের আকার ধারণ করে লবণ জলেই মিশে থাকে; কেবল জলেরই প্রকাশ হয়, তদ্রুপ সাধনার সেই অবস্থায় জ্ঞাতার চিত্তবৃত্তিতে আমি ব্রহ্ম চিন্তা করছি', এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে কেবলমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই প্রকাশ হয়।

-- পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য
শ্রীশ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র সরস্বতী প্রণীতঃ
বেদান্তসারঃ
(বেদান্তদর্শনম্)

*২ পাতঞ্জল দর্শনে যোগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে -

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ।। ২ ।। (সমাধি - পাদ)

চিত্তের অর্থাৎ মনের বৃত্তিসমূহকে নিরোধ করা বা অবরুদ্ধ করার নাম যোগ।

নির্বিকল্প সমাধির ব্যাখ্যা দেবার মত সাধক, যোগী, ঋষি ইতিহাসে বিরল। যিনি জাগ্রত সমাধি বা ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধিতে যে মাত্রায় দেহ

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।। ৩ ।। (বিভূতি - পাদ)

ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত সাধকের হৃদয় যখন স্বরূপশূন্য হবে, অর্থাৎ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে একমাত্র ধ্যেয়বস্তুকেই (ধ্যানের বস্তুকে) প্রকাশিত করবে, চিত্তের এইপ্রকার অবস্থাকে বলা হবে সমাধি।

মহর্ষি পতঞ্জলি বিরচিত 'পাতঞ্জল যোগদর্শনে' চারপ্রকার সমাধির উল্লেখ আছে। যথা - সবিতর্ক সমাধি, নির্বিতর্ক সমাধি, সবিচার সমাধি ও নির্বিচার সমাধি। এর মধ্যে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি হ'ল সবিকল্প সমাধি এবং সবিচার ও নির্বিচার সমাধি হ'ল নির্বিকল্প সমাধি।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা।। ৪২ ।। (সমাধি - পাদ)

ধ্যানে নিবিষ্ট অবস্থায় সাধকের চিত্তে যদি শব্দজ্ঞান ও অর্থজ্ঞান বিলুপ্ত না হয় অর্থাৎ শব্দজ্ঞান ও অর্থজ্ঞান দ্বারা চিত্তের স্বচ্ছ প্রবাহ বাধিত (বাধাপ্রাপ্ত) হয়, তবে তাদৃশ অবস্থাকে সবিতর্ক সমাধি বলে।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।। ৪৩ ।। (সমাধি - পাদ)

সাধক ধ্যানে নিবিষ্ট হলে শব্দজ্ঞান ও অর্থজ্ঞানের স্মরণ না হয়ে যদি একমাত্র ধ্যেয় বস্তুরই প্রকাশ হতে থাকে এবং সাধক স্বরূপশূন্য হন অর্থাৎ নিজস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে যান, চিত্তের এইপ্রকার অবস্থাকে বলে নির্বিতর্ক সমাধি।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।। ৪৪।। (সমাধি - পাদ)

সবিতর্ক এবং নির্বিতর্ক সমাধির লক্ষণ নির্ণয়ের সাথে সাথে সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার এবং নির্বিচার সমাধির ব্যাখ্যাও নির্ণয় করা হ'ল, বুঝে নিতে হবে।

সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি অপেক্ষা সবিচার ও নির্বিচার সমাধি আরও সূক্ষ্মবিষয়ক।

সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি অপেক্ষা সবিচার ও নির্বিচার সমাধি শ্রেষ্ঠ। আবার সবিচার সমাধি অপেক্ষা নির্বিচার সমাধি শ্রেষ্ঠ। এই নির্বিচার সমাধি যোগের চরমতম পর্যায়। যেগিগণ এই নির্বিচার সমাধি বা নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হয়ে সাধনার চরম পর্যায়ে উন্নীত হন এবং মুক্তির আনন্দ লাভ করেন।

-- পাতঞ্জল দর্শন
কালীবর বেদান্তবাগীশ

থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সেই মাত্রায় ফিরে এসে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে পুনর্জীবন লাভ করতে পারেন, নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণ বিবরণ দেওয়া একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এছাড়া নির্বিকল্প সমাধি সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য জানানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হওয়া তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সর্বাবস্থায় পূর্ণ হয়ে আসেন। এই ধরাধামে এসে নতুন করে যাঁকে সাধনভজন করতে হয় না, অর্থাৎ জন্ম থেকে যিনি সিদ্ধ হয়ে আসেন। এই বিশ্বপ্রকৃতির অনন্তগতির সাথে যিনি সবার গতি এক করে মিশিয়ে দিতে পারেন এবং জন্ম মৃত্যুর সকল রহস্য যাঁর নখদর্পণে।

জাগ্রত ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধির বিরল দৃষ্টান্ত জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ। ইংরাজী ১৯৬০ সনে শ্যামবাজার, ৪৬নং ভূপেন বোস এভিনিউর কোলকাতা বাটীতে ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন ব্যাপী দিবারাত্র প্রকাশ্য জনসমক্ষে সহস্র সহস্র ভক্তশিষ্য, কৌতুহলী জনতা, পন্ডিত, দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, সাধক সাধিকা, বিভিন্ন মিশনের মহারাজগণ, চিকিৎসক ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সকলের সম্মুখে, নিজদেহ গোপনস্থানে না রেখে, দেহরক্ষাকল্পে পাহারাদার নিযুক্ত না করে, সকলকে জ্ঞাত করে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হন। চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বারংবার সমস্ত পরীক্ষা - নিরীক্ষা করার পর চিকিৎসকরা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) শরীরে (দেহে) শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন স্পন্দন নেই, নাড়ীর কম্পন নেই, ঠিক যেন মৃতবৎ; অথচ ধীর স্থির নিমীলিত চক্ষু, বসে আছেন গভীর সমাধিতে।

সাধারণতঃ মৃত্যুর পর যে সকল লক্ষণগুলি দেখা যায়, যা পরীক্ষা করেই চিকিৎসকরা ডেথ সার্টিফিকেট (Death certificate) দিয়ে থাকেন, সেই সব লক্ষণই তাঁর দেহে বিদ্যমান ছিল। অথচ মৃত্যুর পর দেহ ঠান্ডা হয়ে যায়, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দেহে পচন ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়, সমস্ত শরীর ফুলে যায়, নাক মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে থাকে, দেহের জয়েন্টগুলি শক্ত হয়ে যায়, পেটে বায়ু জমতে থাকে, দেহের চামড়া, মাংসপেশীর পরিবর্তন হতে থাকে ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মৃতবৎ

অবস্থায় পড়ে থেকেও সাধারণ মৃতদেহের মত এই সকল লক্ষণ তাঁর মৃতবৎ দেহে প্রকাশ পায়নি। বিশিষ্ট চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, পন্ডিত, দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞ ও সাধকেরা নির্বিকল্প-সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মৃতবৎ দেহ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নিরবচ্ছিন্ন জীবন্মৃত অবস্থার পূর্ণরূপ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। ঐ সময় দূরদূরান্তের আশ্রম, মঠ, মন্দির হতে সাধকগণ এবং বিভিন্ন মিশনের মহারাজগণ প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে পর্যবেক্ষণ করতেন।

শাস্ত্রজ্ঞ, পন্ডিত, দার্শনিক, চিকিৎসকগণ পরম বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, কি ভাবে কোন্ যোগবলে প্রকাশ্যে দেহ রেখে দেহ থেকে বেরিয়ে গেছেন। দেহ যেন মৃতবৎ, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান অথচ সমাধিস্থ। এ কোন্ মার্গের সমাধি বলে দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, আবার নিজদেহ নিজেই রক্ষা করছেন। এটা কি জাতীয় সমাধি, তা আমাদের জানা নেই। সমাধি বলতে শাস্ত্র থেকে যতটুকু জানি, নির্বিকল্প সমাধি বলতে যা বুঝায়, তার থেকেও এ সমাধি আরো আরো উচ্চমার্গের সমাধি। নির্বিকল্প সমাধির সম্যক ধারণা শাস্ত্র থেকে আমরা কতটুকুই বা পাই। আর আজ আমরা ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের ধ্যানস্থ নির্বিকল্প সমাধি প্রত্যক্ষ করছি।

এই মৃতুবৎ নির্বিকল্প সমাধি সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের কথায় -- ''মৃত্যুর যে মাত্রা, যে মাত্রায় পৌঁছালে মৃত্যু হয়, সেই মাত্রা স্বাভাবিক জীবনে আসার ফলে মৃত্যুবৎ হলো। কিন্তু সাথে ছিল 'সজাগ'। ঐ 'সজাগ'ই আঁকড়িয়ে রাখে এবং আঁকড়িয়ে রেখে মৃত্যুর মাত্রাকে maintain করতে থাকে। এই দেহ চরম সমাধির স্তরে থাকে এবং ভিতরের চরম সমাধি যে ঘটে যাচ্ছে, 'সজাগ' তা উপলব্ধি করছে। তাই সাধারণ মৃত্যুর মত তাঁর (সমাধিস্থ ব্যক্তির) মৃত্যু ঘটে না। বাস্তবে মনে হয় মৃত্যু থেকে ফিরে আসা যায় না। কিন্তু জানার আকাঙ্খায় অন্তর ধ্যানের দ্বারা জানা বস্তুর মধ্যে অন্তর্ধান করতে পারলে বিশ্বরহস্যের কিছুটা স্বরূপ উপলব্ধি করে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসা যায় এবং সেই উপলব্ধির কথা অপরকে কিছুটা জানানো যায়।''

শ্রীশ্রীঠাকুরের পাড়া প্রতিবেশী এবং গুরুজন স্থানীয় আত্মীয়স্বজনদের মুখ থেকেই জানা যায়, অত্যন্ত ছোট বয়স থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝেই সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। মাত্র ৩ বছর বয়স থেকেই গভীর রাত্রিতে কোনক্রমে খাট থেকে নেমে খাটের নীচে জোড়াসন করে বসে গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতেন। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের মা ও বাবা অত রাত্রিতে খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে খাটের নীচ থেকে টেনে নিয়ে আসতেন। মাঝে মধ্যে চড় - চাপড়ও জুটতো তাঁর কপালে। তারপর আর একটু বড় হ'তেই কলাবাগানে (ধ্যানের একটা বিশেষ জায়গা ছিল) গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হতেন। তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া না গেলে শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাবা কলাবাগানের সেই বিশেষ স্থানটি থেকে গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় শ্রীশ্রী ঠাকুরকে কোলে করে নিয়ে আসতেন।

১৯৬০ সনে ২২ দিন ব্যাপী দিবারাত্র নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সৌম্য স্থূলরূপের বিভিন্ন অলৌকিক অবস্থা সৃষ্ট ও প্রতিভাত হয়েছিল ঠিক একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে বহুদূরের বিভিন্ন স্থান হতে ঘুরে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিবলে। এই সময়ে অহোরহ বিভূতির প্রকাশ ঘটেছে এবং অলৌকিক শক্তিসমূহের বহিস্ফূরণ হয়েছে বিশিষ্ট দর্শক ও ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। এই নির্বিকল্প সমাধির অবস্থায় তিনি বহু কাজ সম্পন্ন করেছেন, বহু ভক্তের বাড়ী গেছেন, আশীর্বাদ রেখে এসেছেন, পায়েস খেয়ে প্রসাদে চিহ্ন দিয়ে এসেছেন, খড়ম জোড়া রেখে এসেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সেসব তথ্য জানা যায়। নির্বিকল্প সমাধি অন্তে নিজ দেহে প্রবেশ করে তিনিই একমাত্র (যতটুকু জানা যায়) সকলের কাছে, প্রকাশ্য জনসমক্ষে নির্বিকল্প সমাধির বিবরণ দিয়েছিলেন। এছাড়া আজ পর্যন্ত যোগ সাধনার সেই চরম স্থানে গিয়ে আবার ফিরে এসে কেউ বিবরণ দিয়েছেন কিনা জানা যায় না।

অবিচ্ছিন্নভাবে একাসনে প্রকাশ্যে নির্বিকল্প সমাধিতে আসীন হয়ে ২১ দিন অতিবাহিত করার পর সমস্ত জল্পনা, কল্পনা, ভয়ভীতির অবসান ঘটিয়ে,

চিকিৎসকদের হতবাক করে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের দেহে প্রথম প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হল। দেহে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সাথে দেহের মাংসপেশীগুলিকে আস্তে আস্তে উজ্জীবিত হ'তে দেখা গেল। এর বেশ কয়েক ঘন্টা পরে রবিবার ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬০, সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে ২২ দিন ব্যাপী দিবারাত্র নির্বিকল্প সমাধি থেকে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত ভক্তশিষ্য, উপস্থিত জ্ঞানীগুণীজন, চিকিৎসক, দর্শনার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের ঐকান্তিক প্রার্থনা ও আনন্দাশ্রুর মধ্যে ধীরে ধীরে চক্ষুদ্বয় উন্মীলন করেন এবং ২২ দিন ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সমাধির পর প্রথম জল গ্রহণ করেন। নির্বিকল্প সমাধি থেকে পুনরুত্থানের পর ৬-৫৫ মিনিটে শ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত ভক্তমন্ডলী, উপস্থিত জ্ঞাণীগুণীজন, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও দর্শকবৃন্দের উদ্দেশ্যে এক সংক্ষিপ্ত অমূল্য আশীর্বাণী প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত আশীর্বাণী
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রথমেই তিনি আদি পালিভাষায় সুমধুর বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকেন।

কয়েকদিন মাত্র কাটল। আর একটু কাজ বাকী। তারপর কোথায় গিয়েছিলাম, তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। কত জায়গায় গিয়ে কত কাজ করতে সময় চলে গেল। কয়েকদিন কেটে গেল। জপ (বীজমন্ত্র) করলে ভিতর থেকে সুর ও সাড়া জেগে উঠবে। যে জপ তোমাদের দিয়েছি, বেশী করে করবে। এই কয়েকদিনে সামান্য কিছু কাজ করেছি। কয়েকদিন কেটে গেল পাহাড়ে। সেখানে এত বরফ পড়েছে যে, সেখান থেকে অনেক সাধু কাজ করছে, তাদের গুহা বরফে ঢেকে গেছে। বরফ চাপা পড়ে মারা যাবার উপক্রম হয়েছে, কোনরকমে বরফ সরিয়ে দেবার, বরফ গলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মনে হয় বেঁচে যাবে।

মাঝে মাঝে একটু বসা দরকার, বয়লারে কয়লা টয়লা না দিলে ইঞ্জিনে মরচে পড়ে খারাপ হয়ে যায়। দেহরূপ ইঞ্জিনের বয়লারে একটু আধটু কয়লা দেবার চেষ্টা করছি। বেদমন্ত্র .....। এই নশ্বর দেহ, পাঞ্চভৌতিক দেহ, পঞ্চভূতেই (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মিশে যায়। দেহ টেকে না। কিন্তু সত্তাটা, পরমচৈতন্যময় সত্তাটা থাকে। যে জিনিসটা দিচ্ছি, অনন্ত ধ্বনির যে সুরটা বীজমন্ত্ররূপে কানে দিচ্ছি, সেইটাতেই বুঝতে পারবে, কাজ করলে। সকলকার জন্য কাজ করে রেখেছি, যাতে সবাই ফল পেতে পারে। এতো শুধু কানে ফুঁ দেওয়া গুরু নয়। গুরু কথা বড় কথা। কাজ করতে হলে খাটতে হয়। কত পরিশ্রম করেছি। বনে না গিয়ে, পাহাড়ে না গিয়ে সাধারণ গৃহে বসে, সকলের মাঝে থেকে তোমাদের দুঃখ ব্যথা বেদনার সাথে মিশে গিয়ে তোমাদেরই একজন হয়ে আমি আমার অসাধারণ সুর বাজিয়ে গিয়েছি। এমন জায়গা নেই, যেখানে আমাকে যেতে না হয়েছে, তোমাদের জন্য কাজ করতে না হয়েছে। ঐ পাহাড়ের সাধুদের বাঁচাবার জন্য কি প্রচন্ড তুষারপাতের মধ্যে ঐ পাহাড়ে গেছি। বরফের বুকে বাড়ি খেয়েছি। বরফগুলোকে গলিয়ে দিতে হয়েছে। তাতে বরফগলা জলে ডুবে গেছি। তাও তাদের কাতর আর্তনাদে সাড়া না দিয়ে পারিনি। তোমাদের দেবার মত যা করা দরকার করেছি। তোমরা কাজ করো। একটি মুহূর্ত্ত সময়ও নষ্ট করো না। কী অক্লান্ত পরিশ্রম করছি। তোমাদের যদি একটা যন্ত্র থাকতো, বুঝতে পারতে। খাটবে তোমরা। আমার উপরে কত নির্যাতন হয়, কত অসুবিধার ভিতর দিয়ে চলেছি। সবকিছু প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে গিয়ে নিজেকে মানিয়ে নেবার, সব সুবিধা করে নেবার চেষ্টা করেছি। কত অপমান, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করেছি। কোনটাই গ্রাহ্য না করে ফুলের মত গ্রহণ করে নিচ্ছি। এত কঠিন কাজ; সহস্র সূর্যের কিরণে, প্রচন্ড তাপে পাহাড় পর্বত গলে যায়, মিশে যায়। আবার অণিমা, লঘিমাগুলো শিশুবৎ হয়ে যায়। সাধনার কোন্ স্তরে পৌঁছালে সেটা সম্ভব হয়, এত কঠিন ও সূক্ষ্ম কাজ, তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। তোমরা গুরুর মর্যাদা রেখো। আমার খোলাখুলি নির্দেশগুলি মনে রেখ। এভাবে আর বেশীদিন থাকা যায় না। আমার আসতে ইচ্ছা ছিল না। যেভাবে অকাতরে বীজ ছিটিয়ে যাচ্ছি, প্রত্যেকটির মর্যাদা রেখ। সেই নির্বিকল্প সমাধির সূচনা

করলাম, আরম্ভ করলাম।

নির্বিকল্প আমার বাল্য বয়সের সাথী ছিল। এই নির্বিকল্প যেখানে শেষ, সেইখান হতে (সেই স্তর হতে) আরম্ভ করে অনেকদূর চলে গিয়েছিলাম। যে জপ দিয়েছি, যে বীজ মন্ত্র দিয়েছি, এর ভেতর ডুবে থাকবে, সমস্ত কিছু পাবে। পাহাড়ে সাধুদের রক্ষা করতে আরও ৪/৫ দিন থাকার দরকার ছিল। তোমাদের ভাবতে হবে না, সব ভাবনা মিটিয়ে যাচ্ছি।

তোমাদের ঠাকুর জীবন্ত প্রাণের মত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ চাহিদার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে আমার বৃহৎ কাজে বাধার সৃষ্টি করো না। কয়েকটা চাহিদা পূরণ না হলে আমাকে ভুল বুঝো না। রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা দূর করতে গিয়ে এখানকার সব চাহিদা যদি মিটাতে যাই, তোমরাই হয়তো বলবে, কেন ঠাকুর বিরাট কাজ না করে এরূপ করে গেলেন?

জীবনের অনন্তগতির পথে গতিশীল হয়ে সবাইকে মিশতে হবে। এখানকার সুখভোগ কিছু থাকে না। তোমাদের অনেক চাহিদা আছে, দুঃখ আছে। কিছু কিছু পূরণ করার চেষ্টা আমি করবো। তবে আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দাও।

আজ এই থাক।

(১৯৬০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর, উপস্থিত ভক্তশিষ্য মন্ডলীর অনেকেই সেদিনের এই অমূল্য ৭/৮ মিনিটের ভাষণটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁদেরই একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃতুল্য মামাতো ভগ্নীপতি শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শ্যামাচরণ সমাজদার মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ভাষণটি তুলে ধরা হল।)

এই বিরল ২২ দিন ব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে একাসনে প্রকাশ্য জনসমক্ষে ধীরস্থিরভাবে সমাধিস্থ অবস্থায় সমাসীন জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের নির্বিকল্প সমাধির দিনগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সহস্র সহস্র ভক্তশিষ্য, পন্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, সাধক,

যোগী মহারাজগণ। ঠিক তেমনই বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ এই বিরল ২২ দিন ব্যাপী অহোরাত্র নির্বিকল্প সমাধি প্রত্যক্ষ করে প্রতিবেদন করেছিলেন তাদের সংবাদপত্রে। সেই সময় অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার পত্রিকা ছাড়াও দুইখানি বহুল প্রচারিত বাংলা পত্রিকা 'আনন্দবাজার' ও 'যুগান্তর' তাদের প্রতিবেদনে নির্বিকল্প সমাধির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন।

যুগান্তর ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬০ (৬ই পৌষ, ১৩৬৭)
নির্বিকল্প সমাধি
৮৬, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা।

বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ শত শত ভক্তবৃন্দ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে একাসনে নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া আছেন। সেই সময় অষ্টসিদ্ধির অণিমা লঘিমা প্রভৃতি দিব্যশক্তির লক্ষণাদি প্রকাশ হইতে থাকে। ইহা তাঁহার জন্মগত অধিকারসূত্রে শৈশবেই লব্ধ হইয়াছে। এবারকার সেইসকল বিভূতির বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা সম্বলিত একটি গ্রন্থ ''সমাধি কি'' নামে আগামী রবিবার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি অবস্থার চিত্রসহ প্রকাশিত হইতেছে।

১৯৬০ সালে ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ একাদিক্রমে ২১ দিন নির্বিকল্প সমাধিস্থ ছিলেন। ২২ দিনের দিন তাঁর সমাধি ভঙ্গ হলে যুগান্তর পত্রিকার সেই সময়কার ঐতিহাসিক প্রতিবেদন --

-- যুগান্তর
শুক্রবার -- ১৫ই পৌষ, ১৩৬৭ (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬০)
জন্মসিদ্ধ
শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী
তিন সপ্তাহাধিক কালব্যাপী
নির্বিকল্প সমাধি অবস্থার

পূর্ণ অবসান ঘটে গত রবিবার খৃষ্টমাস দিবসের সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে। সহস্র সহস্র জনসমাগম হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সমাধি-ভঙ্গের পবিত্র

অনুষ্ঠান পর্ব অত্যন্ত শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। গত একুশ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের মুখমন্ডলে এক অমঙ্গল আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছিল। ধ্যান-মগ্ন আত্মসমাহিত অবস্থার ২১ দিন অতিবাহিত হইলে গত শনিবার সকালে চিকিৎসকগণের মতে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রথম সূচিত হয়। ইতিপূর্বে বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, তাঁহার মধ্যে নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস ক্রিয়ার প্রভাব বিন্দুমাত্র ছিল না। ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রথম প্রথম ফলাদির রস ও জল তাঁহার স্থির অচল মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য বিশেষ সতর্কতাসহকারে চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সবই গড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সেই প্রচেষ্টা স্থগিত রাখা হয়। প্রত্যহ দিনরাত্র সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দ তাঁহার সমাধি অবস্থা দর্শন করিয়া আশঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শনিবার সকালে শ্বাস-ক্রিয়ার সূচনা হওয়ার প্রায় ৩৬ ঘন্টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিলে সমবেত ভক্ত ও দর্শকমন্ডলীর মধ্যে বিপুল আনন্দের উল্লাস ধ্বনি উত্থিত হয়; শত শত নারীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত উলুধ্বনি ও শত শত মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় সূক্ষ্ম হইতে সক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম তেজোদীপ্ত অণু-পরমাণু সংযুক্ত চিন্তাপ্রবাহে শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসিক চেতনা প্রবাহিত হওয়ায় বহুবিধ অলৌকিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বায়ু অপেক্ষা লঘুতর গ্যাসীয় পদার্থ হাইড্রোজেনের সংস্পর্শে যেমন বেলুন ঊর্দ্ধগামী হয়, বাতাস অপেক্ষা সহস্রগুণ লঘুতর ও সূক্ষ্মতর আণবিক অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসিক চেতনা চলিয়া যাওয়াতে কখনও কখনও তাঁহার স্থূল দেহ শূন্যে আপনা আপনি উত্থিত হইয়াছিল। তখন ধরিয়া নিম্নের দিকে টানিয়া আসনে বসানো হইয়াছে। সূক্ষ্মতম বিদ্যুৎ প্রবাহে জল বিশ্লেষিত হইলে উহার রূপান্তর ঘটে প্রায় অদৃশ্যমান সূক্ষ্মতর হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পদার্থ সমূহে; তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তেজোদীপ্ত অণু-পরমাণু সংযুক্ত চিন্তা প্রবাহে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঞ্চভৌতিক দেহ কখনও কখনও বিশ্লেষিত হইয়া ধূম্রাকারে ক্রমশঃ বিলীন হইতে হইতেই সম্পূর্ণ অদৃশ্য লয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাশক্তি জীবজগতের কল্যাণের জন্য নিবদ্ধ থাকায় সেই

ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহার স্থূল দেহের অণু-পরমাণু আবার বাহ্যিক আকার লইয়াছে। সমগ্র চেতনাযুক্ত জীবদেহ হইতে চ্যুত খন্ড খন্ড মাংসকে কখনও কখনও কাঁপিতে দেখা যায়, অথচ জীবন্ত বলিয়া তখন আর প্রতিপন্ন হয় না; সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ববাহ্যজ্ঞান-রহিত স্থূল দেহে খন্ড খন্ড বাহ্য সাড়া সমষ্টিগতভাবে মধ্যে মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করিয়াছিল। নির্বিকল্প সমাধি মৃত অবস্থার আর এক সূক্ষ্মতর অবস্থা বিশেষ; মৃতদেহের উপকরণসমূহ যেমন জল বাতাস প্রভৃতি সমন্বিত পঞ্চভূতে মিলিয়া যায়, সেই অবস্থার একটু সূচনা হইতে না হইতেই তাঁহার মানসিক চেতনার কেন্দ্রীভূত শক্তিসমূহের বহিঃস্ফূরণ মধ্যে মধ্যে দেখা গিয়াছিল। ওভার চার্জ প্রাপ্ত গাড়ীর ব্যাটারীকে সক্রিয় চলনশীল মাত্রায় রাখিবার জন্য যেমন দিনের বেলাতেও উহার বাতি জ্বালান হয়, তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অধিক মাত্রাযুক্ত তেজোদীপ্ত সূক্ষ্ম পরমাণু সমৃদ্ধ স্থূলদেহে স্থিতিশীলতা রক্ষিত হইয়াছিল অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিক শক্তির দীপ্তির প্রকাশের মাধ্যমে।

আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার ২রা জানুয়ারী, ১৯৬১ (১৯শে পৌষ, ১৩৬৭)

বালক ব্রহ্মচারীর ২২ দিন ব্যাপী নির্বিকল্প সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে গত রবিবার, ২৫শে ডিসেম্বর, খৃষ্টমাস দিবসে গোধূলি লগ্নে কলিকাতায় ভূপেন বোস এভিনিউতে। গত শনিবার ২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের একাসনে নিরবচ্ছিন্ন সমাধির ২১ দিন অতিক্রান্ত হইলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার সূচনা প্রথম অনুভূত হয়। শ্বাসক্রিয়ার লক্ষণ পাওয়ায় সকলের মধ্যে আশার সঞ্চার হইল, এবার শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মর্ত্যবাসী ভক্তবৃন্দের প্রাণাকুল ক্রন্দনে সাড়া দিবেন। এই ২১ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র দর্শক ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ অহর্নিশ এক অমঙ্গল আশঙ্কায় দোলায়মান হইয়াছেন। কারণ দিনের পর দিন ফলের রস ও জলটুকু পর্যন্ত পান করাইবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। কচ্ছপ যেমন হস্তপদাদি গুটাইয়া কখনও কখনও জড়বৎ হইয়া পড়িয়া থাকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বপ্রকার বাহ্যিক চেতনাসমূহ তেমনি অন্তর্মুখী হইয়া নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন

করিয়া রহিল। শ্বাসক্রিয়ার সংবাদ পাইয়া ধ্যানাসীন, নির্বিকার, সৌম্যকান্ত দেবমূর্তিকে জাগাইবার জন্য বহু পন্ডিত আসিয়া বেদমন্ত্র গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে লাগিল। বহু সাধক আসিয়া হরিনাম আরম্ভ করিল, নাম, সংকীর্তন দলও সমবেত হইল।

গত রবিবার সন্ধ্যা যখন ৫টা ৫৫ মিনিট তখন দেখা গেল, শ্রীশ্রী ঠাকুরের নয়নদ্বয় হইতে নির্মল অশ্রুধারা বহির্গত হইতেছে। সমস্ত শরীরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের নয়নাশ্রু লক্ষ্য করিয়া শতশত ভক্তবৃন্দের চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল।

''ঠাকুর, ও ঠাকুর, নয়ন মেলিয়া তাকাও,'' এই ঐকান্তিক প্রার্থনায় সকলের অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নরনারী নির্বিশেষে 'গুরুদেব দয়া করো দীনজনে' গানটি সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁহার নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিলেন। দেবতা ও সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দের মধ্যে ২২ দিন পর এই প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র জয়ধ্বনি, মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি ও উলুধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। এ কয়েকদিন ধরিয়া অহোরাত্র নদীর স্রোতধারার ন্যায় জনতার স্রোত প্রবহমান ছিল।

নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসিক চেতনা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তেজোদীপ্ত অণু-পরমাণু দ্বারা অধিকমাত্রায় সংপৃক্ত হওয়ায় অণিমা, গরিমা, লঘিমা প্রভৃতি অলৌকিক শক্তিসমূহের বহিস্ফূরণ কখনো কখনো ঘটিয়াছিল শত শত বিশিষ্ট দর্শক ও ভক্তবৃন্দের সম্মুখে। লঘুতর হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা কোন বস্তু পূর্ণ হইলে যেমন উহা ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতে পারে, তেমনি সূক্ষ্মতর তেজোদীপ্ত পরমাণু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহে অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল হওয়ায় উহা কখনো কখনো শূন্যে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বহিঃপ্রকৃতিতে ছড়ানো রবিরশ্মিমালাকে একটি ভারী কাঁচ বা লেন্স্-এর ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইলে উহারা যেমন পুঞ্জীভূত হইয়া অগ্নিস্ফূরণ ঘটায় কোন কাগজ বা বস্তু বিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল জড় দেহে ব্যাপ্তমান উত্তপ্ত তেজঃরাশি গভীরতম একাগ্রতা

শক্তিবলে মনরূপ নির্মল দর্পণের মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল হইতে থাকায় সমগ্র দেহটি দীপ্ততর তেজে রূপান্তরিত হইয়া কখনো কখনো স্ফূরিত হইয়াছিল। ধ্যানলব্ধ মনঃসংযোগ বা একাগ্রতারূপ সূক্ষ্মতর তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৌম্য স্থূল রূপের ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক অবস্থা সৃষ্ট ও প্রতিভাত হইয়াছিল ঠিক একই সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়; কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার ঘুরিয়া আসা সম্ভব হইয়াছিল অলৌকিক শক্তিবলেই। বিরাট বরফের খন্ড যেমন তাপের সাহায্যে গলিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে অদৃশ্য হইয়া থাকে, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূল দেহ তেমনি অত্যধিক তেজোযুক্ত চিন্তাপ্রবাহে প্রভাবান্বিত হইয়া, ধূম্রবৎ হইয়া মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্স-রে যেমন স্থূল মাংসল বরণ ভেদ করিয়া যাইতে পারে, তেমনি উহা অপেক্ষা সহস্রগুণ সূক্ষ্মতর তেজঃ আকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ রূপান্তরিত হইয়া ধ্যান কক্ষের ভিতরের ছাদ ভেদ করিয়া ছাদের উপর শীতল মুক্ত বায়ুতে আবার স্থূলাকার প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানাসীন হইয়াছিল। তখন তুলিয়া আনিয়া আবার ধ্যানকক্ষে তাঁহাকে ধ্যানাসনে স্থাপিত করা হয়। এরূপ এক একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখায় সেখানে ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছিল। সমাধি ভঙ্গের এক সপ্তাহ পূর্বে সহস্র সহস্র ভক্তগণের সমবেত আকুল আর্তনাদে অর্দ্ধমানসিক চেতনাচ্ছন্ন অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সাড়া কাহারো কাহারো কর্ণে শ্রুতিগোচর হইয়াছিল এই মর্মে যে, তিনি এ যাত্রায় আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। এত ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর একইভাবে ধ্যানাচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। এরূপ অলৌকিক প্রকাশ তাঁহার নূতন নয়। শৈশবে তাঁহার দেহে অষ্টসিদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার গুরুস্থানীয় আত্মীয় স্বজন, তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, বাল্যকালের গৃহশিক্ষক ও বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

"রাম নারায়ণ রাম"

চিরনিদ্রিত সমাধি নির্বিকল্প সমাধি

(১৯৬২)

সমাধি কি সেটা আগে জানা দরকার, ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার। মানচিত্র পাঠ করলেই যেমন দেশভ্রমণ হয় না, তেমনি সাধনায় ব্রতী না হলে, যোগসাধনার মাঝে নিবিষ্ট চিত্তে আত্মনিয়োগ না করলে সাধনার প্রকৃত অবস্থাটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

জীবনমাত্রার পথে সব কিছুই সমাধি। আর সব যোগসাধনারই চরম অবস্থা সমাধি অবস্থা। এই সৃষ্টির মাঝে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রের আবর্তনে বিবর্তনে প্রতিটি জীবই রয়েছে সমাধির এক একটি অবস্থায়। তাই গর্ভস্থ শিশু যখন ভ্রূণাবস্থায় মাতৃজঠরে কূর্মাসনে থাকে, তখন সে সমাধির অবস্থায়ই থাকে এবং সমাধির আসনেই থাকে। সমাধির অবস্থায় থাকার ফলেই দশমাস দশদিন মাতৃগর্ভে দুরূহ যাতনা সহ্য করে ভুমিষ্ঠ হওয়া তারপক্ষে সম্ভব হয়। এইজন্যই সদ্যোজাত শিশু কিছুক্ষণ পরে পরেই নিদ্রিত হয়ে পড়ে। কারণ জন্মের পূর্বে সমাধির যে গভীর সত্তায় সে নিবিষ্ট ছিল, বারে বারে সেই পূর্বের অবস্থাকেই সে ফিরে পেতে চায়। আর জাগ্রত হয়েই সমাধির সেই সুরটি খুঁজে না পেয়ে চিৎকার করে ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনিতে তার সেই ব্যথা

তাই গর্ভস্থ শিশু যখন ভ্রূণাবস্থায় মাতৃজঠরে কূর্মাসনে থাকে, তখন সে সমাধির অবস্থায়ই থাকে এবং সমাধির আসনেই থাকে।

বেদনাকেই যেন সে জানাতে চায়। প্রতিদিনের ঘুমের মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের জানিয়েছেন, নিদ্রা সমাধি বা ঘুমন্ত সমাধির কথা। প্রতিদিনের ঘুম মৃত্যুরই একটি স্তর। প্রতিদিন এই ঘুমের মাধ্যমে আমরা যেন মৃত্যুর বাগান থেকে ঘুরে আসি।

১ লাখ টাকা পাই পয়সা ছাড়া নয়, ঠিক তেমনই জীবনের কোন অবস্থা, কোন মুহূর্ত্তই বাদ দেবার নয়। সমাধিতে জীব যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সে ভিতরে জাগ্রত থাকে, কিন্তু বাইরে নিদ্রিত থাকে। যেমন নিদ্রা সমাধিতে তুমি খাটের উপর শুয়ে আছ, নাক ডাকাচ্ছ, আবার তুমিই স্বপ্নের মাধ্যমে নানা জায়গায় ঘুরছো, বেড়াচ্ছ, মৃত বাবার সাথে কথা বলছো, দৌড়াদৌড়ি করছো। আরও কত কি করছো। অথচ তুমি কিন্তু খাটের উপর চুপচাপ শুয়ে আছ। মাঝে মাঝে নাক ডাকাচ্ছ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই নিদ্রা সমাধিতে তুমি ঘুমাচ্ছ বাইরে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তুমি জেগে রয়েছ, নানা কাজকর্ম করছো। সমাধিতে যখন জীব ঘুমিয়ে থাকে, তখন ভিতরে জেগে থাকে কিন্তু বাইরে ঘুমিয়ে থাকে। এ এক বিরাট রহস্য। ঘুমন্ত সমাধির মাঝে, নিদ্রার মাঝে প্রকৃতির এক বিরাট রহস্য যেন এক অজানা বার্তা নিয়ে আসছে আমাদের কাছে।

জানার আকাঙ্খা ও গভীরতার মাত্রা যার যত বেশী, প্রকৃতির এই অজ্ঞাত রহস্যের পরিচয় সেই মাত্রাতেই সে পেয়ে যাচ্ছে। চর্চা ও সাধনার দ্বারা যে যতদূর অগ্রসর হয়, প্রকৃতি তার কাছে ততটুকুই প্রকাশিত হয়। সাধনার দ্বারা যেটুকু জানলে, সেইপথ ধরে আরও জানার পথে অগ্রসর হলে দেখবে, প্রকৃতির রহস্য তোমার কাছে ক্রমশঃই প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। এটাই সাধনা। ডুবুরী হয়ে বিশ্বমহার্ণবের অতল গভীরতায় ডুব দিয়ে অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করতে যারা চরম আগ্রহশীল তারাই একমাত্র পরম বস্তুর সন্ধান কিছুটা পাচ্ছে, কিছুটা অবগত হচ্ছে। প্রকৃত স্বাদ-এর শত ব্যাখ্যাতেও যেমন কিছুতেই স্বাদটা কেমন অন্যকে বোঝানো যায় না, তেমনি বিশ্ববিরাটের স্বাদটা

চর্চা ও সাধনার দ্বারা যে যতদূর অগ্রসর হয়, প্রকৃতি তার কাছে ততটুকুই প্রকাশিত হয়।

নিজে অবগত হওয়া ছাড়া অপরকে সম্পূর্ণ বোঝানো সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাই নিজে উপলব্ধি করতে হয়। এটাই সাধনা, এটাই ধ্যান ধারণা।

জানার আগ্রহে জানতে জানতে বিশ্বপ্রকৃতির যে সব স্তর ভেদ করতে করতে তোমার দেহমন যেতে থাকবে, সেইসব বস্তুর অণু-পরমাণু তোমার দেহে বিদ্যমান। চুম্বকের সংস্পর্শে যেমন লোহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেইসব সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতীত বস্তুর সংস্পর্শে এসে, তাদের প্রভাবে তোমার দেহের অণু-পরমাণুগুলোও সূক্ষ্ম হয়ে যাবে। তখন তোমার দেহ, এ জগতে থাকা সত্ত্বেও সেই সূক্ষ্মবস্তুর চিরন্তন ধারায় দেহের বস্তুগুলোও চালিত হতে থাকবে। এই দেহের অণু-পরমাণু থেকেই মস্তিষ্ক - সেই মস্তিকের সূক্ষ্মতম অণু-পরমাণুর ধারায় মন। তার থেকেও আবার সূক্ষ্ম বস্তু আছে। সেই ধারায় চলে যেতে পারলে দেহ মন তাদের প্রভাবে এমন প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে যে, তখন তারা সেই ধারায় চালিত হবে।

এই দেহের অণু-পরমাণু থেকেই মস্তিষ্ক - সেই মস্তিকের সূক্ষ্মতম অণু-পরমাণুর ধারায় মন। তার থেকেও আবার সূক্ষ্ম বস্তু আছে। সেই ধারায় চলে যেতে পারলে দেহ মন তাদের প্রভাব এমন প্রভাবান্বিত হয়ে পড়বে যে, তখন তারা সেই ধারায় চালিত হবে।

সৃষ্টির আদিতে যখন কোন দেবদেবতার মূর্তি ছিল না, তখনকার সময়ে যোগী ঋষিরা কিসের সাধনা করতেন? এই বিশ্বরহস্য, সৃষ্টির আদি অন্ত জানার জন্য কোন্ আকুলতায় ব্যাকুলতায় তাদের অন্তরলোক জেগে উঠেছিল? তারা বুঝে নিয়েছিলেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে যে জিজ্ঞাসা জেগে উঠছে, তার সমাধানও মিলবে সেই অন্তরলোকেই। ডুবুরী হয়ে ডুব দিয়ে মননের সুরে খনন করতে হবে। তাই গভীর সুরে মননের দ্বারা বিশ্বভান্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করাই ছিল সাধকের সাধনা, তাদের অন্তরের ধ্যান। এই অন্তর ধ্যানের পথেই বিশ্বরহস্যের মধ্যে অন্তর্ধান করা যায়। অন্তর্ধান অবস্থায় বাহ্যিক আশা-আকাঙ্খা, কামনা বাসনা, এমনকি দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণাও লুপ্ত হয়ে যায়। সেটাই মৃত্যু। কথায় বলে না, তিনি অন্তর্ধান করেছেন।

প্রতিদিনের এই ঘুম, প্রকৃতির সহজাত দান এই ঘুম মৃত্যুরই একটি স্তর, মৃত্যুরই পূর্বাভাষ। আর **ঘুমের মাঝে স্বপ্ন, দেহীর মাঝে বিদেহীরই ইঙ্গিত।** স্বপ্নের মাধ্যমে অনন্ত শক্তি সম্পন্ন মনের দ্বারা কত অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তাই স্বপ্ন হচ্ছে জাগ্রত অবস্থায় জীবন যাত্রার পথে একটা metre. তোমার মনের দ্বারা তুমি কতটুকু কাজ করতে পার, তার metre হচ্ছে স্বপ্ন। সিনেমাতে ২/৩ ঘন্টায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৬০/৭০ বছরের গোটা জীবনের সমস্ত activities দেখিয়ে দেয়। অনন্ত যুগ ধরে ধ্যানধারণার ফলে সাধনার পথে যতটা অগ্রসর হওয়া যায়, স্বপ্নে তা সম্ভব হতে পারে অতি সহজে। মনটা ব্যাপ্তমান হয়ে, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় সমাধির যে অবস্থাটা, সেটা হচ্ছে blotting paper-র মত। সেটা soak করে ঐ বিক্ষিপ্ত মনটাকে ঘোলাটে মনটাকে ফিল্টার করে দেয়। ফিল্টার করে দিয়ে, মনের ঘোলাটে অবস্থাকে দূর করে দিয়ে স্বচ্ছতায় ভরপুর করে দেয়। Mine থেকে খনন করে তুলে পরিশোধন করে যেমন সোনা extraction করা হয়, তেমনি নিদ্রিত সমাধি বা ঘুমন্ত সমাধির ভিতর দিয়ে মনের অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত করে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তাই শূন্যে ওঠা, জলের ওপর দিয়ে হাঁটা স্বপ্নে সবই সম্ভব, বাস্তবে যা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে mind filtered হয়ে যায়। শরীরের nerves, glands গুলোও সব rest পায়। সেই স্বচ্ছ মনে কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থাকে না। সমস্ত glands গুলো তখন এত sensitive হয়ে যায় যে, চিন্তার সাথে সাথে মনের লক্ষ গুণ speed-এ মুহূর্ত্তে কাজ হয়ে যায়। স্বপ্নাবস্থায় মনের এমন একাগ্রতা হতে পারে যে, তখন কোন কিছুই আর অসম্ভব বলে মনে হয় না। তখন ঠান্ডা লাগা, গরম লাগা, উড়ে যাওয়া, মুহূর্ত্তে দূর দেশে যাওয়া সব কিছুই সম্ভব হতে পারে।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে mind filtered হয়ে যায়। শরীরের nerves, glands গুলোও সব rest পায়। সেই স্বচ্ছ মনে কোন দ্বন্দ্ব বা সমস্যা থাকে না। সমস্ত glands গুলো তখন এত sensitive হয়ে যায় যে, চিন্তার সাথে সাথে মনের লক্ষ গুণ speed-এ মুহূর্ত্তে কাজ হয়ে যায়।

কিভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে?

বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব সমস্যা জর্জরিত বিক্ষিপ্ত মনটা স্বপ্নে filtered হয়ে, processed হয়ে concentrated হয়ে যায়। Lense দ্বারা সূর্যের তাপ concentrate করে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া যায়; মুহূর্ত্তে অগ্নিস্ফূরণ হয়। তেমনি স্বপ্নাবস্থায় একাগ্রতারূপ সেই lense-এর উপরে মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোর যখন সংযোগ হয় মননের সাথে সাথে সেগুলো জ্বলে ওঠে, জেগে উঠে স্ফূরণ হয়ে যায়। মনে তখন কোন দ্বন্দ্ব, সমস্যা বা সন্দেহ থাকে না, কোন বিক্ষিপ্ত চিন্তা থাকে না। তাই মনন করার সাথে সাথে, চিন্তার সাথে সাথে কাজ হয়ে যায়। স্বপ্নাবস্থায় মনের যে মাত্রা, মনের যে speed, সেটা যদি জাগ্রত অবস্থায় maintain করা যায়, তবে জাগ্রত অবস্থায়ও অনেক অসম্ভব কাজ সহজে সম্পন্ন করা যায়। শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায় যদি স্বপ্নের সেই স্তর, সেই মাত্রা maintain করা যায়, তবে মনের অনন্ত শক্তিকে আয়ত্ত করে বাস্তবে তার রূপায়ন করা সহজেই সম্ভব হয়।

মৃত্যু ঘুমেরই আর একটি অবস্থা, ঘুমেরই নামান্তর। সমাধিও ঘুমিয়ে থাকারই অবস্থা। সমষ্টিগত সমাধির ভাব বা স্তর নিয়ে যখন একটা সমাধি হয়, তখন চিরনিদ্রায় পরিণত হয়, তাহাই মৃত্যু নামে অভিহিত। আবার হাজার হাজার দিনের ঘুম একত্র করলেই চিরনিদ্রা হয়ে যায়। চিরনিদ্রা হয়ে আরও গভীর সমাধি হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে সেই সমাধিতে দেহের সমস্ত অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে তাপবোধ দেহে ছিল, সে বোধ এখন কোথায়? মাটি চাপা দাও, আগুণে পোড়াও, জলে ভাসিয়ে দাও, সে কথা বলে না, সাড়া দেয় না। তার অন্তর ধ্যান তখন এমন গভীরে পৌঁছেছে যে, তাকে আর পাওয়া যায় না। বিশ্বরূপে তার স্বরূপ তখন ডুবে গেছে। সেটাই অন্তর্ধান।

বিচক্ষণেরা চিন্তা করলেন, যেমন অন্তর্ধানে বাহ্যিক সাড়া থাকে না, বাস্তব কোন কিছুর স্পর্শে সে Response দেয় না, দেহের সেই অবস্থার মাত্রাটাকে জীবিত থাকাকালীন অন্তর ধ্যানের মাধমে, যোগ সাধনার মাধ্যমে

যদি টেনে আনা যায়--দেহ মনকে সেই অবস্থায় উপনীত করা যায়, ক্যামেরায় ছবি তোলার মত যদি সেই অবস্থাটাকে ধরে রাখা যায়, তবে তো অন্তর্ধানের (মৃত্যুর) পর কি আছে না আছে, তা জীবিত কালেই উপলব্ধি করতে পারবো এবং সকলকে সেই বার্তা দিয়ে যেতে পারবো। অন্তর্ধানের অবস্থাকে জীবিত অবস্থায় আনার জন্য তাঁরা (বিচক্ষণেরা) শুরু করলেন অন্তর ধ্যানের সাধনা।

চিরনিদ্রার মাঝে অন্তর্ধান করলে আরও গভীর সমাধি হয়। সেই অবস্থায় গভীর বস্তুর সাথে যোগাযোগ হয়। তখন আর ফিরতে পারে না, আটকা পড়ে যায়। কিন্তু ক্রিয়াগুলি সবই থেকে যায়। Shape-টা রয়ে যায়, বস্তু নষ্ট হয়ে যায় -- লীন হয়ে যায়। তখন মন, প্রাণ, আত্মা অনন্ত বিশ্বের অণু-পরমাণুর সাথে, সেই পরম চৈতন্যের সাথে বিলীন, লীন হয়ে যায়। সমাধির মধ্যে যখন ডুবে যায়, তখনও activities গুলি জীবন্ত থেকে যায়। ক্রিয়াগুলো ভীষণভাবে কাজ করে যায় স্বপ্নের মত।

স্বপ্নে বা সমাধিস্থ অবস্থায় বিরাট ব্যাপ্তমান মন একটা সহজ ধারার মত, ফোয়ারার মত অনর্গল চলতে থাকে। মনকে ফোয়ারার মত চালিয়ে নেবার জন্য সমাধির প্রয়োজন। সাগরের আশেপাশে যেমন শোঁ শোঁ আওয়াজ হয়, সমাধিস্থ অবস্থায় নিজের মাঝেও সেই বিরাট শক্তিশালী নাদ-ধ্বনির আওয়াজ, সেই শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। সেই গভীর আওয়াজে একটা আনন্দ আছে, তন্ময়তা আছে। সেই তন্ময় অবস্থাটা সকলের মধ্যে সর্ব অবস্থায় আছে।

স্বপ্নে বা সমাধিস্থ অবস্থায় বিরাট ব্যাপ্তমান মন একটা সহজ ধারার মত, ফোয়ারার মত অনর্গল চলতে থাকে। মনকে ফোয়ারার মত চালিয়ে নেবার জন্য সমাধির প্রয়োজন।

সমাধি হচ্ছে প্রকৃতির সহজাত দান, স্বপ্ন হল সেই মাত্রা। স্বপ্নের মাত্রার সাথে জাগ্রত অবস্থায় মনের মাত্রা এক করতে পারলেই হবে প্রকৃতির প্রকৃত কাজ। তাই নিয়ম আছে যে, জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে, আবার জেগে উঠেও জপ করতে থাকবে। তখন এমন একটি অবস্থা আসবে যে,

ঘুমালেও মনে হবে, সেই ঘুম সত্যিকারের ঘুম নয়। এমন একটা অবস্থা, যেন স্বপ্ন দেখার অবস্থা। হঠাৎ মনে হল যেন ইষ্ট দেবতা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

এইভাবেই সত্যদ্রষ্টার সত্য আদেশগুলো, সত্যে পরিণত হয়। এভাবেই স্বপ্নে বা সমাধিতে মূর্তির আর্বিভাব হয়। সত্যরূপের প্রতীক হিসাবে আদেশ ও নির্দেশগুলো সত্য হয়, বস্তুগুলো সব একে এক মিলে যায়। তাই মিলতিতে আনতে হলে জপের ধ্বনি, জ্ঞানের ধ্বনি সদাসর্বদা পিপীলিকা যোগের মত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। জপ, ধ্যান যখন অভ্যাসমত আপনা আপনি চলতে থাকবে, প্রকৃত সুর ও সাড়া তখনই মিলবে।

১০ বছরের জপের যে কাজ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ১ মিনিটে করা সম্ভব হতে পারে। ধ্যানের অবস্থাটা যদি স্বপ্নের ভিতরে প্রতিফলিত করা যায়, তখন দেখা যাবে, ১০ বছরের গুণগুলো ১ সেকেন্ডে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। জাগ্রত অবস্থাকে যদি স্বপ্নে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ স্বপ্নের ঐ মাত্রাটাকে জাগ্রত অবস্থায় maintain করা যায়, তবে ৫/১০ হাজার বছরের কাজ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ১ সেকেন্ডে করা সম্ভব হয়। তাই জাগ্রত আসন হতে স্বপ্নের আসনে উপবেশন করতে হবে। জাগ্রত আসন হতে উঠে গিয়ে স্বপ্নের সেই আসনকে ধরতে হবে।

১০ বছরের জপের যে কাজ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ১ মিনিটে করা সম্ভব হতে পারে। ধ্যানের অবস্থাটা যদি স্বপ্নের ভিতরে প্রতিফলিত করা যায়, তখন দেখা যাবে, ১০ বছরের গুণগুলো ১ সেকেন্ডে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বস্রষ্টা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে সেই আসন আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। প্রতিদিন ঘুমের মাধ্যমে সেই আসন আমাদের সম্মুখীন করছেন। আর আমরা সে আসন দূরে সরিয়ে রেখে দিনের পর দিন নাক ডাকাচ্ছি। তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে আসনে বসা আর হচ্ছে না। সে আসন প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত খালিই রয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সজাগ করে দেবার জন্য সচেতনতার সুরে সাড়া দিয়ে

চলেছেন। প্রতিদিনের ঘুমের মাধ্যমে, নিদ্রিত সমাধির মাধ্যমে, স্বপ্নের মাধ্যমে প্রকৃতির প্রকৃতিস্থ সত্যিকারের রূপকে আমাদের সম্মুখীন করা হচ্ছে আমাদের সত্যিকারের সত্যরূপকে তার সাথে মিশিয়ে দেবার জন্য, আমাদের অবগতকে অবগত করার জন্য।

স্বপ্নের আসনে উপবেশন করলে কি লাভ হবে? যে সমস্ত বুঝ বা জ্ঞান সীমাবদ্ধভাবে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যেন সীমাবদ্ধ না থেকে অসীম অনন্ত জ্ঞানের ধারার সাথে, চির যোগাযোগের সুরে, চিরতরে যুক্ত হয় তারজন্যই এই আসন। জাগ্রতের ভূমি আসন হতে উঠে গিয়ে স্বপ্নের আসনে উপবেশন করলে স্বপ্নের স্ফূরণের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে বিরাটের সত্যিকারের সত্যরূপকে, বাস্তবের সত্যরূপকে, প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বরূপকে। বাস্তবরূপের সত্যকে তখন প্রতিমুহূর্ত্তেই ধরা যাবে। **স্বপ্ন হচ্ছে চিরজাগ্রত সত্যের একটি ছায়া ও কায়া। স্বপ্ন হচ্ছে মহাসূর্যের একটি ধারা।** প্রতিটি জীবই যে অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত তেজের শক্তিতে পরিপূর্ণ, এটি বুঝার ইঙ্গিত রয়েছে প্রতিদিনের স্বপ্নের মাধ্যমে। তাই প্রকৃতির অনন্ত শক্তির সাথে একমুখী হয়ে যাবার জন্য, এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর একটি স্তর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে কি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, সবই আছে, আবার কিছুই থাকছে না। এই চিরন্তন সত্যের সাড়াকে সমাধির সুরের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট করার জন্যই স্বপ্নের প্রয়োজন। ঘুমিয়ে থাকার সমাধিই সবচেয়ে বড় সমাধি। এই যে আমরা বিশ্ববিরাটকে অবগত হতে পারছি না, এই সৃষ্টির রহস্যের অনেক কিছুই জানতে বা বুঝতে পারছি না, এটা অজ্ঞানতা নয়, মূর্খতা নয়, এটা ঘুমিয়ে থাকার মতই আর একটি সমাধির অবস্থা। জানার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে জানতে জানতে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই এই অজ্ঞানতার আবরণকেও ভেদ করা যাবে। জানার জন্য যখন সত্যিকারের আকুলতা, ব্যাকুলতা প্রকাশ পাবে, তখনই আবরণ ও দরজা আস্তে আস্তে খুলে যাবে আর সম্মুখে উপস্থিত হবে সত্যিকারের রূপ।

স্বপ্ন হচ্ছে চিরজাগ্রত সত্যের একটি ছায়া ও কায়া। স্বপ্ন হচ্ছে মহাসূর্যের একটি ধারা। প্রতিটি জীবই যে অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত তেজের শক্তিতে পরিপূর্ণ, এটি বুঝার ইঙ্গিত রয়েছে প্রতিদিনের স্বপ্নের মাধ্যমে।

বাস্তব জগতে মৃত্যু বা অন্তর্ধানই জীবজগতের গন্তব্য বা অন্তিম পথ। সেই গন্তব্যে পৌঁছাতে বড় জোর ৮০ থেকে ১০০ বছর লাগে। আমরা যদি জীবিত কালেই সেই ৮০ থেকে ১০০ বছরের মাত্রাটুকু বুঝে নিয়ে অন্তর ধ্যান বা যোগসাধনার মাধ্যমে সেই মাত্রাকে দুই এক বছরের মধ্যে আনতে পারি, তবে তো দুই এক বছরেই আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারবো। এইভাবে গন্তব্যের মাত্রা বুঝে নিয়ে চর্চা বা সাধনার দ্বারা সেই মাত্রাকে আয়ত্তে আনতে পারলেই ইচ্ছামত গন্তব্যে যাওয়া যাবে, আবার ফিরে আসা যাবে। ফিরে এসে সেই অভিজ্ঞতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরা যাবে। অন্তর্ধানের (মৃত্যুর) মাত্রাটা যদি ১ লক্ষ হয়, আর আমরা ১ বছরে যদি সেই মাত্রাটাকে আয়ত্ত করতে পারি; আমাদের ধ্যান-ধারণায়, চিন্তার গভীরতায় জীবিত অবস্থাতেই যদি ১ লক্ষ মাত্রাকে আনতে পারি, তবে অনেক অল্পসময়ে ইচ্ছামত অন্তর্ধানের (মৃত্যুর) স্তরে পৌঁছান যেতে পারে। দেহ তখন মৃতবৎ হয়ে পড়ে, কিন্তু চেতনা সজাগ থাকে। তাই উপলব্ধির জগতে পৌঁছান যায় এবং সাধনার দ্বারা মাত্রা কমানো বাড়ানোটা তখন ইচ্ছাধীন হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে আবার ফিরে আসা যায়।

বাস্তব জগতে মৃত্যু বা অন্তর্ধানই জীবজগতের গন্তব্য বা অন্তিম পথ। সেই গন্তব্যে পৌঁছাতে বড় জোর ৮০ থেকে ১০০ বছর লাগে।

জীবজগতের সবকিছুই এই অন্তর্ধানের পথের পথিক। সেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রীদের পরিক্রমায় প্রকৃতির উদয় অস্তের মত জীবনের উদয় অস্ত চলছেই। চেষ্টা করলে ১ লক্ষ মাত্রার পথ ১ বছরে বা ১ দিনে বা ১ মুহূর্ত্তে আনা যায়। তখন আর উদয় অস্ত থাকবে না। অথচ উদয় অস্তের উপলব্ধিটা থাকবে।

আমরা যদি মহাপ্রস্থানের পথের ১০০ বছরের গতিবেগটা অন্তর-ধ্যানের মাধ্যমে, সাধনার মাধ্যমে বাড়িয়ে জীবিত অবস্থায় অন্তর্ধানের স্তরে পৌঁছাতে পারি, তখন নিশ্চয়ই আমরা জানতে পারবো, বুঝতে পারবো অন্তর্ধানের পর কি হয়। সেই স্তরে পৌঁছাতে পারাই হ'ল মহাপ্রয়াণ, সেই চির-সমাধি অবস্থা। **চির নিদ্রিত সমাধি, নির্বিকল্প সমাধির** অবস্থা।

ঘুম হচ্ছে সেই চির সমাধির প্রথম অবস্থা। নিদ্রিত অবস্থায় জীবের দৈহিক অবস্থা প্রায় মৃতবৎ থাকে। অথচ মন তখনও সচেতন ও সক্রিয়। স্বপ্নে সে কোন্ জগতে গেল, সেখানে কি করলো, সবকিছুই জাগ্রত অবস্থায় ফিরে এসে সে বলতে পারে। এটাই কিন্তু চির সমাধি থেকে ফিরে এসে তখনকার অভিজ্ঞতা যে বর্ণনা করা যায়, তারই আভাষ। প্রকৃতি দত্ত এই arrow mark দেখেই সাধকেরা, যোগীরা জীবিত অবস্থায় যাতে সেই স্থানে পৌঁছে আবার ফিরে আসা যায়, তারই সাধনায় রত হলেন। তাঁদের সাধনার সিদ্ধান্ত হলো অন্তর্ধান অন্তর-ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত। এই অন্তর-ধ্যানের পথে সে জগতে (মৃত্যুর পরে অন্য জগতে) পৌঁছাতে পারলে বাইরের সত্তা আর থাকবে না, অথচ বুঝ ঠিক থাকবে। সেই অবস্থায় দেহ মৃতবৎ, চেতনা মৃত্যুঞ্জয়। বাইরের জগতের কোন কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারছেনা। অথচ কি ঘটছে না ঘটছে, সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

এটাই কিন্তু চির সমাধি থেকে ফিরে এসে তখনকার অভিজ্ঞতা যে বর্ণনা করা যায়, তারই আভাষ।

যোগী যখন সাধনার দ্বারা সে জগতের (next world) সাথে যুক্ত হয়, তখন এ জগতের সব কিছুই তাঁর স্পর্শে আসছে, অথচ কোনকিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তখন মনের গতি এত দ্রুত ও স্পষ্ট হয় যে, অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। সেই দৃষ্টিতেই তাঁর দর্শন হয়। তারপর ধীরে ধীরে সে যখন পূর্বের স্থানে ফিরে আসে, তখন সে সেই জগতের কথা চিন্তা করতে পারে, বর্ণনা করতে পারে। ডুবুরী হয়ে ডুব দিয়ে যা দেখেছে, যা পেয়েছে, তার বার্তা দিতে পারে।

যোগী যখন সাধনার দ্বারা সে জগতের (next world) সাথে যুক্ত হয়, তখন এ জগতের সব কিছুই তাঁর স্পর্শে আসছে, অথচ কোনকিছুই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তখন মনের গতি এত দ্রুত ও স্পষ্ট হয় যে, অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়।

উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি নয়। যে মহান উদ্দেশ্যে যে সচেতনতার ধারা ধরে ধরে জীবকূল সৃষ্ট হয়ে চলেছে, সেই মহা সুরের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে কারা? এগুলো হচ্ছে রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনা, ব্যথা,

বেদনা। এরাই সেই মহা সঙ্গীতের যন্ত্রবিশেষ, মহামন্দিরের মহাগহ্বরের মহা পান্ডা। সেই মহা সুরের সন্ধান দিয়ে মৃতুরূপ পরমতীর্থে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য এরা (রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা) সব প্রকৃতির প্রহরী। বসে আছে পান্ডা হয়ে কবে তুমি যাবে সেখানে। এরা বলছে, ''পথিক, সময় নেই, সময় নেই, তাই এসেছি পান্ডা হয়ে। মন্দির নিকটেই, তোমাকেও যেতে হবে সেখানে''। প্রতিদিনের হাঁচি, কাশি, বায়ু, পিত্ত, কফ -- একটু একটু করে জানিয়ে দেয় শেষের পথের সন্ধান, দেহ যে শেষ হওয়ার পথে তারই সূচনা করে দেয়। তীর্থের পথে পান্ডারও দাম আছে, রোগ, শোক, হাঁচি, কাশিরও দাম আছে। মৃত্যুরূপ মহাতীর্থের সন্ধান, তার বার্তা ওরাই ধ্বনিত করতে থাকে প্রতিমুহূর্ত্তে। এই পথে ওরাই প্রকৃত বন্ধু। ওরা না থাকলে মহাতীর্থের সেই মহা সুরের কথা জানা হত না। ওরা চায় তোমরা সেই মহাতীর্থে গিয়ে পিন্ড দাও বিষ্ণুর পাদপদ্মে।

যাবার দিনে এরা (রোগ, শোক প্রভৃতি প্রকৃতির প্রহরীরা) বলে, ''হে জীবগণ, চলে যাচ্ছ। পথের পাথেয় কী নিয়ে গেলে?'' পরম শান্তি কামনা কর, চিরযুগের শান্তি কামনা কর। শুধু ৫০/৬০ বছরের শান্তি কামনা করেছ'। চিরযুগের শান্তির কামনা এতে হয় না। মনে হচ্ছে সাময়িক মুক্তি ও শান্তি পেলে। কিন্তু সাময়িক মুক্তি ও শান্তি, শান্তি নয়। ৬০ বছরের সাময়িক খেলার জন্য ঔষধ দিয়ে বারবার আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছ। বরাবর তাড়াবার ক্ষমতা কারও নেই। শেষ পর্যন্ত আর এড়াতে পারলে না। আজ তুমি কাদের তাড়াবে? কোন খেলনার বস্তু, সাময়িক সুখের বস্তুতো আজ সাথে যাচ্ছে না। হে পথিক, চিরশান্তির পথে তোমার এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। চিরযুগের সেই পরমশান্তির জন্য যদি কামনা করতে, তবে শ্বাসে প্রশ্বাসে মহাশ্বাসের খেলা খেলতে, ব্রহ্মের সুর টানতে। সেই টানই হচ্ছে নিনাদের সুর; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার সুর, মূলাধার হতে সহস্রারের টানের সুর। হে পথিক, এই দেহ ত্যাগ করে যখন চলে যাবে চিরনিদ্রিত সমাধির সুরে, তখন আফশোস হবে, মহাশ্বাসের খোরাক তো

যাবার দিনে এরা (রোগ, শোক প্রভৃতি প্রকৃতির প্রহরীরা) বলে, ''হে জীবগণ, চলে যাচ্ছ। পথের পাথেয় কী নিয়ে গেলে?''

কিছুই দেওয়া হল না। এই বিশ্ববিরাটের সুরের সাথে, মহাশ্বাসের সুরের সাথে নিজ নিজ দেহযন্ত্রের শ্বাসকে তো এক করা হল না। সীমিত জ্ঞান, সীমিত চিন্তাকে অনন্ত সুরের আহ্বানে এক করে সেই অনন্ত সুরধারায় নিজের সুরকে মিলিয়ে দেওয়া তো হল না। হায়, হায়, বৃথাই সময় চলে গেল।

তাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে দিতে হয় মূলমন্ত্রের সুর, দিতে হয় নাদ ধ্বনির সুর, নিনাদের সুর। এটাই হল জীবের প্রকৃত খোরাক। সেই খোরাক পেলেই জীব ভিতরে ভিতরে ভরপুর হয়ে যায়, পূর্ণ হয়ে যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে অহোরহ বীজমন্ত্র জপের সাথে সাথে তোমার ভিতরে যখন জেগে উঠবে পরিপূর্ণতার সেই মহা সুর, মহা ধ্বনি, তখন সেই গুম গুম ধ্বনি, ওম্ ওম, ধ্বনি ভিতরে বাজতে থাকবে সদাসর্বদা। তখন পান্ডারা বলবে, ''হে পথিক, আজ বুঝেছ তো, তোমাকে কোথায় নিয়ে এলাম।'' তাই রোগ, শোক, দুঃখকে পাপের বোঝা মনে হলেও এরাই পরম বন্ধুর মত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সজাগ করে দিচ্ছে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে সেই পরম পথের সন্ধান দিচ্ছে। কিন্তু আমরা কেউ এদের মর্মের কথা বুঝছি না। এরা, এই রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা প্রভৃতি প্রকৃতির প্রহরীরা চিৎকার করে বলছে, ''হে জীবগণ, তোমাদের কারও স্থায়িত্ব নেই। মৃত্যুরূপ মহা দৃষ্টান্ত দিয়েও তোমাদের হুঁশিয়ার করতে পারছি না। একদিন তো আমাদের নিয়ে আসতেই হবে। সেদিন দেখা যাবে, পাথেয় নেই। সবারই হাত খালি। মন্দিরের কোন ধ্বনি কানে যায় না। শোনার মত জিনিস নিয়ে তো আসনি। তাই সে মহা সুর শুনতে পাও না। সত্যিকারের সেই সত্য সুরের কথা আর বুঝতে পার না।''

মৃত্যুরূপ মহা দৃষ্টান্ত দিয়েও তোমাদের হুঁশিয়ার করতে পারছি না। একদিন তো আমাদের নিয়ে আসতেই হবে। সেদিন দেখা যাবে, পাথেয় নেই। সবারই হাত খালি। মন্দিরের কোন ধ্বনি কানে যায় না। শোনার মত জিনিস নিয়ে তো আসনি। তাই সে মহা সুর শুনতে পাও না। সত্যিকারের সেই সত্য সুরের কথা আর বুঝতে পার না।

অন্তর ধ্যানের (সাধনার) গভীরতায় ডুবে বিশ্ববিরাটকে চিনতে চেষ্টা কর। যত একাগ্র হবে উপলব্ধির পথে, মহাকাশের মহার্ণব থেকে ততই

অমুল্য সম্পদ এসে তোমার সাথে তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে। সেটাই হচ্ছে প্রকৃত যোগ।

সত্যিকারের সত্যরূপ জানিয়ে দেবার জন্য বিশ্ববিরাট আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সৃষ্টির আদি অন্ত কতভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি সৃষ্ট জীবই যে মহাসমাধির মহাসাগরে দোলায়মান, এই পরম সত্যটি উপলব্ধি করে সেই মহাসমাধির মাঝে সমাহিত হয়ে অহোরাত্র বীজমন্ত্র ধ্বনিত করতে পারলেই পাওয়া যাবে সেই পরম সত্যের সন্ধান, মিলে যাবে সেই পরম পথের পাথেয়।

''রাম নারায়ণ রাম''

মৃত্যু! না চিরতরে চিরনিদ্রায় অভিভূত

(০৬-০৮-১৯৮৯)

প্রতিদিনের এই 'নিদ্রা' আর 'জাগরণ'-এর মাধ্যমে প্রকৃতি আমাদের কি বলতে চাইছে, বলতো? প্রতিদিন তুমি একটানা ৪/৫ ঘন্টা ঘুমিয়ে থাক। তুমিই এখানে শুয়ে আছ। আবার স্বপ্নের মধ্যে তুমি ঘুরতাছ কিন্তু চারদিকে। বুঝতে পারছো কথাটা? তখনও তুমি যে ঘুমিয়ে আছ, এই কথাটা সহজে মনে পরতাছে না। তুমি যে ঘুমিয়ে আছ, এই কথাটা মনে না পড়লে কি হবে? তুমি তো ঘুমিয়েই আছ। তোমার এই যে ঘুমন্ত অবস্থা এটা একজাতীয় মৃত্যু, (one kind of death). কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যে ঘুরে আসছো, এটা আত্মার মত মনে কর একটা। এইখানে থাইকা তুমি হাট করতাছ, বাজার করতাছ, খেলা করতাছ, তাহলে এইগুলি সব ঘুমন্ত অবস্থায় হচ্ছে। আত্মাটা মনে কর, কাম কাজগুলি করতাছে। তুমি ঘুমিয়ে আছ, তোমার আত্মাটা মনে কর, ঘুরছে। মনে করে নাও, বুঝতে পেরেছ? তুমি ঘুমিয়ে আছ, তারপর জাগলে তো সেই কথাটা মনে পড়ছে। জাগলে যে কথাটা মনে পড়বে, সেই মনে পড়ার কথাটা কিন্তু মনে রাখবে। তাহলে বুঝতে পারছো যে, একটা কিছু ঘটনা ঘটছে ঘুমন্ত অবস্থায়। সেটা পাগলামিতেই হোক, ছাগলামিতেই হোক, মাথা গরমেই হোক, যাই হোক।

তোমার এই যে ঘুমন্ত অবস্থা এটা একজাতীয় মৃত্যু, (one kind of death) কিন্তু ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে যে ঘুরে আসছো এটা আত্মার মত মনে কর একটা।

তুমি কিন্তু সেটা টের পাও নাই ঘুমের অবস্থায়। তুমি কিন্তু ঘুমের অবস্থায় উঠে ঘুরে বেড়াও নাই। তুমি কিন্তু ঘুমিয়েই ছিলে। স্বপ্নটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, মৃত্যুর পরে আত্মা আছে কি নাই, সেই কথাটা। এখন মনে কর, ৮০ বছর পর্যন্ত তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলা। কত ফুলবাগানে গেলা, কত মার খাইলা, কত বোম পড়লো, মাথার উপর পইরাও (প'রেও) পড়লো না। আবার স্বপ্নে ঘর সংসার করতাছ। স্বপ্নে বাচ্চা হইতাছে, স্বপ্নে প্রেম করতাছ, স্বপ্নে রাগারাগি করতাছ, মারামারি করতাছ, সব কিন্তু করতাছ - তুমি ঘুমিয়েই রয়েছ। তুমিই খেলা করছো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। তুমি কিন্তু ঘুমিয়েই আছ। নিজে কিন্তু খাটের উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া আছ। জাগলে তোমার মনে পড়ছে সব কথা, এই দেখলাম, এই করলাম। এই কথাটা, এই ঘটনাগুলো তোমার মনে পড়ছে কেন? তাহলে দেখছি, দুটো আলাদা আছে। তোমার খাটে শুয়ে থাকাটা এবং স্বপ্ন যেটা তুমি দেখছো, দুটো আলাদা বস্তু। দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একটা বস্তু তুমি ঠিকই আছ। আরেকটা বস্তু, যেটা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে ঘুরে ফিরে আসছো, দুটো কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নর খেলা একটা। স্বপ্ন স্বপ্নই, যেটা মোহিত করে রাখে। ঐটার কোন ভিত বা ঐটার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায় না। স্বপ্নের সব কথার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায় না। কিন্তু ঘটনাটা তো ঘটে গেল। স্বপ্নে ঘটনা যে ঘটছে, সেটা তো অস্বীকার করা যায় না।

ইঞ্জিন বন্ধ আছে, আবার ইঞ্জিন কিন্তু চালু আছে। সেটা যখন থামে ইঞ্জিনটা ভিতরে চালু থাকে। তা না হলে সব নিভা যাইব গিয়া। ভিতরে চালু রাখে, জানো তো? ইঞ্জিন ভিতরে চালু রাখে। ভিতরে চালু রাখা সত্ত্বেও বাইরে কিন্তু বন্ধ রাখে। একটা বন্ধের চালু আর একটা চলার চালু। বন্ধের একটা চালু আছে, জানো তো? একটা চলার চালু, আর একটা বন্ধের চালু। পাখাটা খোলাও একটা চালু, আবার পাখাটা বন্ধ করাও একটা চালু। বুঝতে পেরেছ? তুমি ঘুমিয়ে আছ। আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্নটা দেখছো, কে দেখছে? স্বপ্নটা

তাহলে তোমারই দুটো সত্তা, এক, তুমি চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছ, আর দুই, তুমি স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে কাজকর্ম করে আসছো। আবার জেগে উঠে তুমিই তোমার স্বপ্নের ঘটনা বলতে শুরু করেছ।

কে দেখছে? তুমিই তো দেখছো। জেগে উঠে আবার স্বপ্নের বৃত্তান্তটা বলতে পারছো। তাহলে তোমারই দুটো সত্তা। এক, তুমি চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছ; আর দুই, তুমি স্বপ্নের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে কাজকর্ম করে আসছো। আবার জেগে উঠে তুমিই তোমার স্বপ্নের ঘটনা বলতে শুরু করেছ। সত্যেন বোস, পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক মহেন্দ্রলাল সরকার, সেও পৃথিবী বিখ্যাত লোক। দুজনকেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর উত্তর দাও।

আত্মা সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। তাইলে ঘুমিয়ে যদি একটু স্বপ্ন দেখ, ৮০ বছরের ঘুমটা যদি একত্র কইরা দেওয়া যায়, তার স্বপ্নটা কোথায় থাকবে? সে তো ঘুমিয়েই রইল। রোজগার মতন ঘুম। এই যে প্রতিদিন ঘুমাচ্ছ, ৮০ বছরের ঘুমটা যদি একত্রে দেওয়া যায়, সে লোক বাঁচবে? সেই লোক বাঁচতে পারে? ঘুমের ওষুধ ২টা খাইলেই অচৈতন্য হইয়া ঘুমাইয়া থাকে, আর সেখানে যদি ২০০/২৫০ বড়ি খাওয়াইয়া দেওয়া যায়, সে উঠতে পারবে? কোনদিনই উঠতে পারবে? তবে চিন্তা কইরা দেখ, এই ৮০ বছরের ঘুমের বড়ি যদি একদিনে খাওয়ানো যায়, তবে সে চিৎ হইয়া রইল, আর উঠলো না। ৮০ বছরের ঘুম যদি একত্র হইয়া যায়, সে আর কোনদিনই উঠতে পারবে না। সে তখন চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। এই ঘুমই কিন্তু তার ইঙ্গিত। অনেকে আবার তাকিয়েও ঘুমায়। চোরে চুরি কইরা লইয়া যাইতেছে, তাকিয়েই আছে। দেখে না। সে কিন্তু ঘুমিয়েই আছে। চোখ নিজে দেখে না। বাল্‌ব নিজে জ্বলে? খালি একটা বাল্‌ব নিজে জ্বলে? বাল্‌বটা ঠিকমত লাগালে তবে তো জ্বলে? বাল্‌বটা পকেটে করে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দেয়। চোখটা একটা বাল্‌ব। বাল্‌ব fit করা হইল। তখন জ্বলে উঠলো, দেখলো। বুঝতে পারছো? তাহলে ৮০ বছরে যখন সে ঘুমিয়ে রইলো, চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলো, সে তো আর উঠবে না। ৮০ বছরের ঘুমটা যখন একত্র করা হইল, সে গেল কোথায়? সে তো তখনও স্বপ্ন দেখতাছে। বুঝতে পারছো? সে তখনও জাগা (জাগ্রত)। তোমার কাছে জাগা (জাগ্রত) না। ঘুমিয়ে যে যখন থাকে, তোমার সঙ্গে তখন তার কোন কিছু নাই। এই রোজ যে ঘুমাও, যে ঘুমাল সে পড়ে

৮০ বছরে যখন সে ঘুমিয়ে রইলো, চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলো, সে তো আর উঠবে না। ৮০ বছরের ঘুমটা যখন একত্র করা হইল, সে গেল কোথায়? সে তো তখনও স্বপ্ন দেখতাছে।

এমনি জলটা ধরে রাখা যায়? ধরা যায় না। সেই জলটাকে ধরতে পারছো, আতি ঠান্ডা যদি তাকে দেওয়া যায়। তখন চাকা হয়ে যায়। এখন প্রতিদিনের স্বপ্নটা হচ্ছে জলের মত। তুমি এখানে শুয়ে থেকেও ঐখানে দাঁড়াইয়া অথবা ঐ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলতে পারো না, 'এই আমি আসছি।' তুমি কিন্তু ঘুমানো। 'আমি আসছি। তোরা বুঝতে পারছিস্?'

রইল, এটা একজাতীয় মৃত্যু। রোজই তোমাগো মৃত্যু হয়। রোজই তোমরা জাগো। রোজই একটু একটু করে তিল তিল করে মরছে আর ঐগুলি সব জমছে। এইটা যখন ৮০ বছরে একত্রিত হয়, সব তিলগুলি যখন একত্রিত করা হইব, সেইদিন চিরতরে ঘুম। সেইদিন আর উঠলা না, জাগলা না। কিন্তু স্বপ্নটা তো থেকে গেল। তখনকার যে স্বপ্নটা, সেই চিরতরে ঘুমের যে স্বপ্নটা, তখন যে স্বপ্নে ঘুরে বেড়াও, সেটা তো আর বলা হচ্ছে না। কারণ সেই ঘুম থেকে তো আর জাগলেই না। এখনকার স্বপ্নে, প্রতিদিনকার স্বপ্নে যখন ঘুরে বেড়াও, সেখানে কিন্তু স্থায়ী হয়ে থাকতে পার না। জাগলে আবার যে কে সেই। তুমি যেমন ছিলে, তেমনই আছ। কিন্তু মনে পড়ে। এই 'মনে পড়া'-টাই হল মারাত্মক কথা। তোমাকে জাগিয়ে জানিয়ে দিল যে, আমি আছি। আমি দেখছি। তাহলে 'দেখছি' যখন হচ্ছে, স্বপ্ন যখন বুঝতে পারছো, তখন বুঝা গেল, একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটা কি? এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এই বাড়ী থিকা সেই বাড়ী গেলা স্বপ্নে, সেই বাড়ী থিকা ঐ বাড়ী গেলা। কিন্তু থাকতে পারছো না। বরফটা জমলো না। আমাদের এই শীতে ঠান্ডায় বরফ জমে না। কিন্তু হিমালয় পর্বতে প্রচন্ড ঠান্ডায় এই জলটাই কিন্তু জমে যায়। বুঝতে পারছো? জলটা জমে solid হয়, তখন জলটাকে ধরা যায়। জলটা বরফ হয়ে solid হয়ে গেল তো? এমনি জলটা ধরে রাখা যায়? ধরা যায় না। সেই জলটাকে ধরতে পারছো, আতি ঠান্ডা যদি তাকে দেওয়া যায়। তখন চাকা হয়ে যায়। এখন প্রতিদিনের স্বপ্নটা হচ্ছে জলের মত। তুমি এখানে শুয়ে থেকেও ঐখানে দাঁড়াইয়া অথবা ঐ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলতে পারো না, 'এই আমি আসছি।' তুমি কিন্তু ঘুমানো। 'আমি আসছি। তোরা বুঝতে পারছিস্?' মাকে হয়তো বললে, মা দরজাটা খুইলা (খুলে) দাও তো। আমি আট্‌কা পইরা গেছি।

-- এ্যাঁ? তুই তো ঘুমানো।
এই কথা বলতে পারো এখন?

এখন এই কথা বলতে পারবে না। জলটা ছিটা দিলে দরজার ফাঁক দিয়াও জলটা বাইরাইয়া (বেরিয়ে) যাইতে পারে। এই পর্যন্তই হইছে। কিন্তু আটকা পড়ছে না। চাকা হতে পার নাই। প্রতিদিনের এই যে ঘুমটা আছে, এই ঘুমে বরফ জমে না। বরফটা জমলো না। ৮০ বছরের ঘুমটা একত্র যখন হলো, তখন যে বেরিয়ে গেল, তখন কিন্তু বরফটা জমে গেল। তোমরা বুঝতে পারছো কথাটা? অতি কঠিন কথা, কঠিন তত্ত্ব। অতি সহজ করে বলছি। ৮০ বছরের ঘুমটা যখন হলো, তখন যে স্বপ্নটা দেখলো, ঐটা কিন্তু বাইরে বরফ হইয়া গেল। ৮০ বছরে dead body-টা এখানে পইরা (পরে) রইছে অর্থাৎ চিরতরে ঘুমন্ত দেহটা পরে আছে। চিরতরে ঘুমিয়েই গেছ, মরে গেছ বলবো না, চিরতরে ঘুমিয়েই গেছ। তখন যে স্বপ্নটা দেখতাছ, তখন যে স্বপ্নটা হচ্ছে, স্বপ্নটা হবেই ভিতর থিকা, সেই যে স্বপ্নটা, সেটা বাইরাইয়া গিয়া দাঁড়িয়ে আছ। দাঁড়িয়ে থাইকা, ইচ্ছা কইরা বলতে পার যে, 'মা', মা যদি না থাকে, ''দাদা, আমি কিন্তু এখানে আছি। আমি আসতে পারছি না। আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্রোতে। তোমরা দুঃখ করো না। আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি।'' এই কথা বলতে পারতাছ তখন। কারণ তখনকার যে স্বপ্ন, তাতে জলটা জমে বরফ হয়ে গেছে, solid হয়ে গেছে। এই জলই কিন্তু ফ্রিজে রাখলে জলটা জমে বরফ হয়ে যায়। আর এই বাতাসের মধ্যে জলের থিকা বরফটা পাচ্ছ না। কিন্তু ঐটার মধ্যে ফ্রিজের মধ্যে জলটা গেলে তাপের মাত্রাটা কমে যায়। বরফের দেশের মাত্রাটা, এখানে (ফ্রিজের মধ্যে) আনা হইছে বইলা এইখানে দেখ জলটা বরফের চাকা হইয়া গেল। কত বড় বরফের চাকা। তোমার যখন শেষ, ৮০ বছরে যখন শেষ হইয়া গেলা, তখন ফ্রিজের মধ্যে বরফের মতন জমে গেলা। ৮০ বছরের সমস্ত ঘুমটা একত্র হইয়া গেছে তো, তখনকার সময়ে যে স্বপ্নটা দেখলা, সেইটা কিন্তু জমাট বেঁধে গেল। জানো তো, শেষ হইয়া যাওয়ার আগেও কিন্তু স্বপ্ন দেখে। পরশু মরবে, দুইদিন আগেও স্বপ্ন দেখতাছে। তারমধ্যে স্বপ্নের খেলা চলছে। Metre -এর মাত্রা উঠতাছে। তখনও জানিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতি, 'সাবধান'। এখনও

দাঁড়িয়ে থাইকা, ইচ্ছা কইরা বলতে পার যে, 'মা', মা যদি না থাকে, ''দাদা, আমি কিন্তু এখানে আছি। আমি আসতে পারছি না। আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্রোতে। তোমরা দুঃখ করো না। আমি যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি।''

তোমার এই অবস্থা, সমাধিরই অবস্থা। এই ঘুমটা কিন্তু সুখের জন্য দেওয়া হয় নাই। এই ঘুমটা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সুরকে জানিয়ে দেবার জন্য, প্রকৃতির তত্ত্বকে জানার জন্য; পইরা পইরা খালি ঘুমাইয়া থাকার জন্য নয়। তোমার অন্তরের ক্ষুধার এই খাদ্যটা কিন্তু দিতে পারতাছ না। ভাতটা নাক দিয়া ঢুকায় না, ভাতটা কান দিয়া ঢুকায় না। ভাতটা কিন্তু যেখান দিয়া দেবার দরকার সেখান দিয়াই দেয়। ঘুমটা শুধু আরামের জন্য নয়। শুধু কোলবালিশ জড়াইয়া শুইয়া রইলা--কি ঘুম, কি ঘুম। আরেকটু নেশা খাইয়া আরেকটু ঘুমাইলা। বড়ি খাইয়া আরেকটু ঘুমাইলা। এই ঘুমটা কিন্তু সখের ঘুম না। এই খাদ্যটা কিন্তু ঠিক নয়। এই খাদ্যটা কিন্তু অখাদ্য। ঐটার খাওয়াটা তুমি দাও। সেইজন্য ঘুমের মধ্যে নাক ডাকাটা হয় অনেকের। না খাইলে যেমুন পিত্তি পড়ে, নাক ডাকাটা এই কারণেই হয়। পিত্তি পড়ে জানতো? না খাইয়া থাকো একদিন। পেট ডাকতে শুরু করে, 'খাওয়া দে। কিছু খাওয়া দে।' তাইলে এইটা পিত্তি পড়লো, নাকের মধ্যে পিত্তি পরার মতন।

এই ঘুমটা কিন্তু সুখের জন্য দেওয়া হয় নাই। এই ঘুমটা দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির সুরকে জানিয়ে দেবার জন্য, প্রকৃতির তত্ত্বকে জানার জন্য; পইরা পইরা খালি ঘুমাইয়া থাকার জন্য নয়।

তোমার নাক ডাকার শব্দ, তুমি ঘুমিয়ে আছ কিন্তু। তুমি টের পাচ্ছ না, আরেকজন টের পাইতেছে। কইতাছে, 'দেখরে, আমার খাওয়া দিতাছস্ না। না খাওয়াইয়া রাখছস্।' সুতরাং সে ডাক দিয়া বলতাছে, 'হে পথিক, হে যাত্রিক, আমাকে কিছু খেদে দে। আমি ক্ষুধায় কিন্তু অস্থির হয়ে পড়েছি। আমাকে কিছু খেতে দে।' এখন অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় নাক ডাক তো দেখি। এখন নাক ডাকলে রক্ত বেরিয়ে যাইব গিয়া। সুতরাং ঐ যে শেষ দিন, মৃত্যুর যে শেষ দিন, তখন যে স্বপ্নটা দেখবি, সেই স্বপ্নটা জমাট বেঁধে যাবে। ঐ জমাট বাঁধাটা, ঐ স্বপ্নটায় তর (তোর) যাওয়াটা* তুই দেখতে পারবি। কথাটা বুঝলি?

সুতরাং ঐ যে শেষ দিন, মৃত্যুর যে শেষ দিন, তখন যে স্বপ্নটা দেখবি, সেই স্বপ্নটা জমাট বেঁধে যাবে। ঐ জমাট বাঁধাটা, ঐ স্বপ্নটায় তর (তোর) যাওয়াটা* তই দেখতে পারবি। কথাটা বুঝলি?

* সুখচর ধামে যে সকল আবাসিকরা থাকতেন শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে একদিকে যেমন পরমপিতা ছিলেন, আর একদিকে অভিভাবকও ছিলেন। তাই ঘরোয়া তত্ত্ব আলোচনার সময় তত্ত্ব বুঝাবার জন্য যেমন তাদের নাম ধরে ধরে বলতেন, আবার সন্তান স্নেহে 'তুই, তুমি ইত্যাদি বলে সম্বোধনও করতেন।

তুই বলতাছোস্ ''ওরা যে পইরা আমার জন্য কান্নাকাটি করছে, ওরা কান্নাকাটি করছে কেন? আমি তো আছি। আমি তো যাই নাই। আমি তো এখানে আছি। ওরা কান্নাকাটি করছে কেন?'' তুই সব বুঝাইতে শুরু করছোস্। আবার তুই চিৎকার করতে শুরু করছোস। চিৎকার কইরা বলতাছোস্ -- তোর সেই চিৎকারটা অরা (ওরা) শুনতে পাইতেছে না। দরজা বন্ধ কইরা চিৎকার দিলে শুনা যাইব কেম্নে কইরা? আট্কা থাকলে তো চিৎকার দিলে শুনা যায় না। তখন তুই চিৎকার দিতাছোস্। ওরা তো ৫ ঘন্টা ঘুমের পথিক। আর তুই ৮০ বছরের ঘুমের পথিক। ৫ঘন্টা ঘুমের পথিকদের কাছে ৮০ বছরের শব্দটা কানে আসবে না। অগো (ওদের) তো সেই কান নাই। তুই চিৎকার করতে শুরু করছোস্, ''তোমরা কেঁদো না। আমি আছি। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছ না?'' হলে কি হবে? বন্ধ ঘরে অন্ধকারে চিৎকার হচ্ছে তো? টের পাচ্ছে না।

জীবনের যাত্রার পথে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিক্ষণে প্রতিদিনকার সমাধি চলছে প্রতিদিন। প্রতিদিনকার সমাধি চলছে। এইভাবে চলতে চলতে শেষ সমাধিতে গিয়ে যখন দাঁড়াবে সেদিনই 'শেষ'। প্রতিদিনের ঘুমের সমাধি চলছে প্রতিদিন। প্রতিদিনের এই সমাধি একত্র হয়ে যেদিন হবে চির-সমাধি, সেদিনই টলে পড়ে। আর উঠতে পারবে না। কোনদিনই উঠবে না। কারণ তখন তোমার স্বপ্নটা জমাট বেঁধে গেল। সেই শেষ স্বপ্নটা যে দেখে, সেইটা জমাট বেঁধে গেল। সেইজন্য প্রকৃতি তোমাদের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে যে, স্বপ্ন দেখেও ঘুম থেকে জেগে যে স্বপ্নের কথা বলতে পার, এর মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছে যে, স্বপ্নটা অলীক হলেও, কিছু না হলেও এইটা একটা metre. জীবনযাত্রার চলার পথে একটা metre, মাত্রা, এটা একটা ইঙ্গিত। এই ইঙ্গিতটা পূর্বাভাষ। সুর্যের উদয় এবং অস্তের পূর্বাভাষ দেখতে পাওয়া যায় চারিদিকে। কিন্তু সূর্যের কোনদিনও উদয় হয় না, সূর্য কোনদিনও অস্ত যায় না। আমরা ঘূর্ণীপাকে ঘুরছি বলে সূর্যের উদয় এবং অস্ত দেখতে পাই। উঠানের মধ্যে যদি পাক দিয়া ঘুরতে থাক, মনে হয় বাড়ীঘর ঘুরতাছে। বাড়ীঘর ঘোরে না, তর (তোর) মাথা ঘোরে, মনে রাখিস্।

প্রতিদিনের ঘুমের সমাধি চলছে প্রতিদিন। প্রতিদিনের এই সমাধি একত্র হয়ে যেদিন হবে চির-সমাধি, সেদিনই টলে পড়ে। আর উঠতে পারবে না। কোনদিনই উঠবে না।

তাই জীবনের প্রতিদিনকার সমাধির মূল্য দিবা। এই জপটা দিয়েছে কেন? ঐ খোরাকের জন্য। ঐ খোরাকের অভাবেই পিত্তি পড়ছে। এই জপটা জাগ্রত অবস্থায় রাইখা যদি ঘুমন্ত অবস্থায় সমাধি অবস্থায় ঐ জপটারে চালু কইরা রাখতে পার, তবে ঐ নাক ডাকাটার মধ্য দিয়া খাওয়াটা 'ও' (দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিবেক বা পরম চৈতন্য) পেয়ে যাবে। খাওয়াটা পেয়ে গেলে তখন বলবে, 'পেয়েছিরে পেয়েছি। এতদিনে খোরাক পেয়েছি'। আর এতদিন খোরাক দিছস্ যত আজেবাজে খোরাক। সেগুলো ভিতরে (অন্তরের অন্তঃস্থলে) কোনদিনই ঢোকে না।

এই জপটা জাগ্রত অবস্থায় রাইখা যদি ঘুমন্ত অবস্থায় সমাধি অবস্থায় ঐ জপটারে চালু কইরা রাখতে পার, তবে ঐ নাক ডাকাটার মধ্য দিয়া খাওয়াটা 'ও' (দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিবেক বা পরম চৈতন্য) পেয়ে যাবে। খাওয়াটা পেয়ে গেলে তখন বলবে, 'পেয়েছিরে পেয়েছি। এতদিনে খোরাক পেয়েছি।'

তাই মনে রাখবি, আমার অসুস্থ শরীর। জীবনযাত্রার পথে বললাম দুই, চারটি কথা। বলতে গেলে, সব তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে আমার প্রায় ৮/১০ ঘন্টা সময় লাগবে। এটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি, এটার মধ্যে গণিত আছে। অতি কঠিন তত্ত্বকে আমি সহজ কইরা তগো বুঝাইছি। কেউ এভাবে সময় নষ্ট করবে না। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে প্রতি দিনে কোন সময় নষ্ট করো না। আজেবাজে কথা বলবে না। এই জিহ্বা আজেবাজে কথা বলার জন্য নয়। জিহ্বা কিন্তু সত্য। একটা জিহ্বায় কত কথা বলে বলো তো। টক দিলে টকের কথা বলে। মিষ্টি দিলে মিষ্টির কথা বলে। তিতো দিলে তিতোর কথা বলে। একটা চুল যদি জিহ্বায় পড়ে থুঃ করে ফেলে দেয়। তোমারে জিজ্ঞাসাও করে না। নিজেই ফেলে দেয়। চোখে কুটা গেলে আপনিই চোখ বুঁজে যায়। তোর বুদ্ধি নিয়ে করে না। প্রকৃতির নিয়ম এগুলো। প্রকৃতি অতিমাত্রায় সচেতন। সেই সচেতনতার দিকটায় প্রত্যেকে নজর রেখো।

ভুল করো না পথিক, যাত্রিক। সবাইকে কিন্তু যাত্রা করতে হবে অন্তিম পথে। কেহ ৬০ বছরে, কেউ ৭০ বছরে, কেউ ৮০ বছরে; যেতে হবেই। প্রতিদিনের ঘুম সেই একদিনে জমা হবে। সেদিন মৃত্যু হবে। আর প্রত্যেকদিন কিন্তু মৃত্যুর সাথে বন্ধুত্ব করছো, যুক্তি করছো। প্রকৃতি তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাই তর্কে বিতর্কে, ভুল ভ্রান্তিতে চলবে না। এতটুকু বাচ্চা

বয়স থেকে প্রকৃতির সুরের সাথে সুর মিলিয়ে চলেছি। প্রকৃতির সুর তার যে স্বরগ্রাম যতটা পেয়েছি, তারই কিছু কিছু তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি। পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক যতসব, অনেকের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বের কথা শুনে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে গেছে। শুধু আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে। আমি গেঁয়ো মানুষ। গেঁয়ো ভাষায় গেঁয়ো ভাবে কথা বলেছি, পান্ডিত্যভাবে বলি নাই। তাতেই তারা সব এসে লম্বা হয়ে পড়েছে। তাদের লম্বা হয়ে পড়ার কথা নয়। লম্বা হয়ে পড়ুক, সেটাও আমি চাই না। আমার পায়ে পড়ুক, সেটা আমি চাই না। আমারে বড় বলুক, ভগবান বলুক, সেটা আমি চাই না। আমার গভীর তত্ত্বের সুরটা ভাল করে বুঝুক। আমি কি বুঝেছি, সেটা আগে বুঝুক। আমি এখানে দেবতা বনতে আসি নাই, ঠাকুর বনতে আসি নাই।

আমি অনন্ত সুরের পথিক। যে সুরটা আমি জেনেছি, সেই সুরের কথাটা তোমাদের আমি জানাচ্ছি যে, তোমরা ভুল করো না। গণিতে ভুল করো না। কারণ গণিতের শেষ অঙ্কের ফলটা তোমরা জেনে গেছ। মৃত্যু, তার নাম দিয়েছে। আমি মৃত্যু বলি না। এটাকে বলে, চিরতরে চিরনিদ্রায় অভিভূত। চিরনিদ্রায় অভিভূত অবস্থাটা কি? সমস্ত জীবনের ঘুমগুলো একত্র হয়ে যখন আসে, তখনই ঢলে পড়ে। কিন্তু তারমধ্যে থেকে যে স্বপ্নটা দেখে, সেই সময়কার যে স্বপ্ন, ঐ স্বপ্নটা হবে তখন জাগ্রত স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের সত্তাটা solid হয়ে গেল। বরফের মতন চাকা হয়ে গেল। তখন তোমার অবস্থাটা কি হবে? তখন সব বুঝতে পারবে। তখন দেখবে যে, ঠাকুরের আদেশ পালন করি নাই। ঠাকুরের নির্দেশমতো চলি নাই। সামান্য টাকার জন্য ছলচাতুরী করেছি। সামান্য একটা ছেলের জন্য অথবা একটা মেয়ের জন্য কত চাতুরী করেছি। আমার এই অপরাধের জন্য কে দায়ী হবে? কেউ হবে না। যার যার অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সে দায়ী। যে যা করেছে বুঝেশুনেই করেছে। প্রকৃতি তোমাকে বুঝেশুনে সব করতে দিয়েছে।

আমি অনন্ত সুরের পথিক। যে সুরটা আমি জেনেছি, সেই সুরের কথাটা তোমাদের আমি জানাচ্ছি যে, তোমরা ভুল করো না। গণিতে ভুল করো না। কারণ গণিতের শেষ অঙ্কের ফলটা তোমরা জেনে গেছ। মৃত্যু, তার নাম দিয়েছে। আমি মৃত্যু বলি না। এটাকে বলে, চিরতরে চিরনিদ্রায় অভিভূত।

অন্যায়টা কর, না বুঝে কর না। বুঝেই কর। যদি না বুঝে করতা, তবে প্রকৃতির দোষ দিতা। প্রকৃতিরে বলতা, 'তুমি তো বুঝাইয়া দাও নাই'। কিন্তু প্রতিটি কাজ তুমি বুঝে করছো। অন্যায় করছো, হিসাবে গোলমাল করছো, এই জিনিষ, ঐ জিনিষ নয়ছয় করার চেষ্টা করছো। পাঁচ টাকার জিনিষ তিন টাকা দিয়া দিয়া কিনা পাঁচ টাকায় বিক্রী করছো, কোন মেয়ের পিছনে লাগছো, মেয়েটা তোমার পিছনে লাগছে। এই সমস্ত আজে বাজে যতরকম কাজ, যতরকম উক্তি আছে, সবকিছু বুঝে করছো। কথাটা বুঝতে পেরেছ? প্রকৃতি তোমার বুঝটা কিন্তু দিয়া দিছে সাথে seal মাইরা। তুমি তোমারে ফাঁকি দিতে পার, বুঝকে ফাঁকি দিতে পারবে না। বুঝরে ফাঁকি দিলে বুঝ তোমার পক্ষে আসবে না। বুঝ নিরপেক্ষ; যেটা সত্য যেটা ন্যায় সেইদিকে বুঝ থাকবে। তুমি বুঝেরে ধাক্কা দিয়া কাজ কইরা আসতাছ। তোমাকে তুমি ফাঁকি দিতাছ। আমি আদেশ দিচ্ছি, আমি নির্দেশ দিচ্ছি। সেইজন্যই গুরু।

গুরু নির্দেশ দিচ্ছেন, গুরু আদেশ দিচ্ছেন যে, কত আর অন্যায় করবে? কত আর ইন্দ্রিয় নিয়ে খেলা করবে? এই ইন্দ্রিয়গুলির চাহিদা পূরণ করতে পেরেছ? ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা পূরণ করতে পেরেছ? যতক্ষণ জীবিত থাকবে, কেউ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা পূরণ করতে পারবে না। রোগে, শোকে, দুঃখে, ব্যথায়, যন্ত্রণায় তোমাকে ঘিরে ধরছে। যতদিন পর্যন্ত না শেষ ঘুম আসবে, ততদিন পর্যন্ত এরা প্রকৃতির প্রহরী হয়ে থাকবে। তোমাকে তিলে তিলে, তিলে তিলে নিয়ে যাচ্ছে সেই মহা শ্মশানের পথে। ব্যথায়, বেদনায়, যন্ত্রণায়, আঘাতে, প্রত্যাঘাতে, রোগে, শোকে তোমাকে দিন দিন কিন্তু guard দিয়ে যাচ্ছে। guard দিচ্ছে আর দেখছে, 'তুই কি করছিস্?' আর তিলে তিলে (প্রতিক্ষণে) বলছে, 'চল, চল।' ওরা সবসময় বলছে, 'চল পথিক, আজ ১ তিল হয়ে গেল। আজ দুই তিল হয়ে গেল। আজ ৩ তিল হয়ে গেল। ৩৬৫ দিন হয়ে গেল। আরও আসলো। ২০ বছর হয়ে গেল, ৫০

গুরু নির্দেশ দিচ্ছেন, গুরু আদেশ দিচ্ছেন যে, কত আর অন্যায় করবে? কত আর ইন্দ্রিয় নিয়ে খেলা করবে? এই ইন্দ্রিয়গুলির চাহিদা পূরণ করতে পেরেছ? ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা পূরণ করতে পেরেছ? যতক্ষণ জীবিত থাকবে, কেউ ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা পূরণ করতে পারবে না।

পথিক, আর কিন্তু বাকী নাই। কাল তোমার শেষ দিন। আমরা বিদায় নেব কালকে। তোমার থেকে চিরতরে বিদায় নেব। হিসাবের খাতায় রইল তোমার জীবনের খেলা।

বছর হয়ে গেল। আমরা কিন্তু তোমার দ্বারে রয়েছি। তোমার কাছে রয়েছি। পথিক, আর কিন্তু বাকী নাই। কাল তোমার শেষ দিন। আমরা বিদায় নেব কালকে। তোমার থেকে চিরতরে বিদায় নেব। হিসাবের খাতায় রইল তোমার জীবনের খেলা। যেই খেলায় কত খেলনা নিয়ে খেলা করেছ, যা যা ত্রুটি বিচ্যুতি করেছ, প্রকৃতির খাতায় রইল তার হিসাব। জবাবদিহি করবে প্রকৃতির দরবারে। তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে। প্রকৃতির এত অফুরন্ত ঐশ্বর্য দিয়ে, এরকম তৈরী করে তোমাকে যে পাঠালাম, তার কতটা ইজ্জৎ তুমি রক্ষা করতে পেরেছ? তার কতটা মূল্য তুমি দিয়েছ? হে পথিক, পাথেয় কতটা সঞ্চয় করেছ? শেষ বিদায়ের শেষক্ষণে প্রকৃতির প্রহরীরা বলবে, 'হে পথিক, তুমি এখন চলে যাচ্ছ। আমরা বিদায় নিচ্ছি। কত কষ্ট, কত আঘাত, প্রতিঘাত তোমার সামনে আমরা দেখেছি। প্রকৃতির দরবারে গিয়ে আমরা তোমাকে উপস্থিত করাচ্ছি।' সেইমত তারা চলে গেল। তখন সেই যে জাগ্রত স্বপ্ন, প্রতিদিনকার স্বপ্নের মত যে শেষ স্বপ্ন সেটা solid হয়ে গেল, বরফ হয়ে গেল। সেই বরফটাই হল তোমার অস্তিত্ব। তোমার অস্তিত্বটা সেখানে তার মধ্যে রয়ে গেল।

স্বপ্নে অস্তিত্ব থাকে না? গিয়া কথা বলো না অন্যের সাথে? স্বপ্নে যে গান গাও, তুমি কি এখানে গান কর? এখানে বিছানায় তো তুমি শুয়ে আছ। সেই গানটা তুমি ধরে রাখতে পারছো না। কারণ অল্প সময়ে এই ঠান্ডায় জল বরফ হয় না। ৮০ বছরের চিরনিদ্রার স্বপ্নটা যখন জমাট বাঁধবে, তখন তুমি দৌড়াদৌড়ি করছো স্বপ্নে। তখন তোমার সত্তাটা যা কিছু এখানে, ঐটার মধ্যে ঘুরতে থাকবে। সেই বুঝটা এরকম, কি অন্যায় করেছ, কি অপরাধ, কি ত্রুটি করেছ, কি ভুল করেছ, ভাল করে বুঝতে পারবে। আর ঠাকুর যে পরিশ্রম করে গেলেন, তাঁর আদেশ কতটা অমান্য করেছ, কতটা ফাঁকি

কি অন্যায় করেছ, কি অপরাধ, কি ত্রুটি করেছ, কি ভুল করেছ, ভাল করে বুঝতে পারবে। আর ঠাকুর যে পরিশ্রম করে গেলেন, তাঁর আদেশ কতটা অমান্য করেছ, কতটা ফাঁকি দিয়েছ। ঠাকুরের কাছে এসে প্রত্যেকে কে কতটা ভাল সেজেছো।

আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার সন্তানরা কি করেছে? আমি শুধু একটি কথাই বলবো, আমি যে আদেশ দিয়েছি, যে নির্দেশ দিয়েছি, তা যদি অমান্য করে, অবহেলা করে, তারজন্য দায়ী তারা, আমি নই।

দিয়েছ। ঠাকুরের কাছে এসে প্রত্যেকে কে কতটা ভাল সেজেছো, সেটাও বুঝতে পাববে। আমার কাছে এলে আমি চুপ করে থাকি। কোন জবাব দিই না। বুঝেও আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে প্রকৃতির দরবারে। সেখানে দরবারে যখন আমাকে ডাকবে, আমার শুধু একটি মাত্র কথা। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার সন্তানরা কি করেছে? আমি শুধু একটি কথাই বলবো, আমি যে আদেশ দিয়েছি, যে নির্দেশ দিয়েছি, তা যদি অমান্য করে, অবহেলা করে, তারজন্য দায়ী তারা, আমি নই। **প্রকৃতির দরবারে আমারও যেতে হবে। কেউ রেহাই পাবে না।** কিন্তু পবিত্র স্বচ্ছভাবে গুরুর আদেশ নির্দেশ পালন করলে কত সুন্দর হয়, বলতো? মেঘটা কতদূর? শেষ সীমানা পর্যন্ত আছে? ২ মাইল, ৩ মাইলের মধ্যে মেঘ আছে, ভুলে যেও না। তাতেও সূর্যকে ঢেকে রাখে। তাহলে কি বলবা যে, সূর্যের থিকা মেঘের ক্ষমতা বেশী? সূর্যের থিকা মেঘ বড়? কিন্তু সূর্য এমনই বস্তু সে মেঘের আড়ালে থেকেও নিজেকে বুঝতে জানে। তাই মেঘের আড়ালে সে অপমানিত হয় না।

তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখ। মেখাচ্ছন্নের মত আচ্ছন্ন করে রাখ। তাতে আমি বুঝেও হাসিমুখেই তোমাদের সাথে কথা বলি। ভুলে যেও না। প্রত্যেকে ভুলে যেও না। ঐ মেঘই আবার পরিষ্কার করে দেবে। X-ray যন্ত্রে চামড়াটা ওঠে না। X-ray যন্ত্র দেখেছ? চামড়াটা ওঠে? শুধু হাড়গুলি দেখা যায়। X-ray যন্ত্র দেখে যদি কাউকে ভালবাসতে যাও, কি আমার ভালবাসার জন, হাঁ কইরা একটা কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে; তখন আর কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছা করবে? সবার মধ্যেই ঐ কঙ্কালটা কিন্তু রয়ে গেছে। শুধু খেড়কুটা দিয়া মূর্তি বানায়। মূর্তিগুলো খেড়কুটা দিয়াই তো বানায়। লেপ, প্রলেপটা দেয় বলেই তো মনে হয়, কি সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে। কি সুন্দর। আর খেড়কুটা দেখলে? পাড়াইয়া পাড়াইয়া কাইটা কাঠি দিয়া কাঠি দিয়া দাঁড়া করায় কাঠামোটা। প্রত্যেকের ভিতরে কিন্তু ঐ কাঠামো সব কঙ্কাল। সব এক মাইটা, দুই মাইটা কইরা মাটি দিয়া দিয়া সব চেহারা করছে। ভুলে যেও না।

তাই গুরুর আজ্ঞা বহন করা আর গুরুর নির্দেশ মত চলাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। জীবনের চলার পথে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে চললেই জীবন সার্থক। মানুষের কানকথা, মানুষের নানারকম বাজে কথায় নিজেকে বিভ্রান্ত করবে না। বিভ্রান্ত হওয়াটাই হল স্বাভাবিক। কারণ একটা জিনিস তো দেয় নাই প্রকৃতি। আটকে রেখেছে তোমাদের কাছ থেকে। সেটি হল, অন্তর্যামিত্ব। অন্তর্যামিত্বটা যদি দিত, তাইলে কেউ কাউরে ভালবাসতে পারতো না। কেউ কারও লগে মিশতে পারতো না। কারণ প্রত্যেকের ভিতরের কথাটা জেনে ফেলতো সবাই। প্রকৃতি এইটা দেয় নাই। আর যে ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতাটা তোমার ভিতরে আছে, এইখানে চাবি দেওয়া আছে। সেই ইচ্ছাশক্তি থাকলে কথায় কথায় রাগ করতা, তুই অন্ধ হইয়া থাক। অন্ধ হয়ে যাইতো। তাহলে এই রাস্তা দিয়া চলছে যারা, একটারও দৃষ্টিশক্তি থাকতো না। রাগের ঠেলায় নিজেরা রাগারাগি করতা, 'যা তুই অন্ধ হইয়া থাক।' দেখতা, রাস্তায় শুধু অন্ধই চলছে। সেইজন্য ঐ জায়গাটায় আটকাইয়া রাখছে। নাহলে এরা তো ইচ্ছামতন যা তা করবো। কিন্তু ফুটবে। যখন ফুটবে, তখন ধীরস্থির নম্র হয়ে যাবে। কারও কথায় রাগ হবে না। তখন তোমার ফুটবে। নাবালকের হাতে টাকা দিলে টাকা নষ্ট কইরা দেয়। সাবালক হইলে, বুদ্ধিমান, বিবেচক হইলে সেই টাকাটা গুছিয়ে রাখে। তোমাদের ক্ষমতা সবই আছে। কোনটা কোনটা আটকা আছে। আর কোনটা কোনটা তোমার ইচ্ছাধীন। আর এখন যেটুকু দিয়েছে, যে capital দিয়েছে, তাই দিয়েই অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। বহু ক্ষমতাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, বিবেক আছে। এগুলি কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। কারণ অন্যায় করে যদি বুঝতে না পারতা, তাহলে তোমাদের দোষ হতো না। যে অন্যায় করে, বুঝেই করে। একটা বাচ্চা পর্যন্ত একটা বিস্কুট নিলে এমনি করে লুকাইয়া নিয়া যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্যায় বুঝতে পারে। যতদিন পর্যন্ত যার যার অন্যায়, ত্রুটি, অপরাধ বুঝতে পারবে, সে

গুরুর আজ্ঞা বহন করা আর গুরুর নির্দেশ মত চলাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। জীবনের চলার পথে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে চললেই জীবন সার্থক।

যতদিন পর্যন্ত যার যার অন্যায়, ত্রুটি, অপরাধ বুঝতে পারবে, সে প্রকৃতির দরবার থেকে রেহাই পাবে না, মনে রেখো।

প্রকৃতির দরবার থেকে রেহাই পাবে না, মনে রেখো।

আর গুরু হচ্ছেন বিবেক। তিনিই তোমাদের সবসময় বাঁচিয়ে চলার জন্য চেষ্টা করছেন। হে পথিক, যাত্রিক চলার পথে সাবধান, সাবধান। রাস্তায় লেখা থাকে না, সাবধান, সাবধান। স্কুল থাকে, হাসপাতাল থাকে সাবধান, সাবধান। Caution লেখা থাকে। আর এই সাবধানতা অবলম্বন না করে গুরুর আদেশ যদি অমান্য কর, এরচেয়ে অধর্ম আর কিছু নেই। এরচেয়ে অজ্ঞ, এরচেয়ে মূর্খ, এরচেয়ে অপরাধী আর কেউ নেই। গুরুর আজ্ঞা বহন করাই হবে একমাত্র শ্রেষ্ঠ কাজ। গুরুর আজ্ঞা বহনকারী হবে ধন্য। এখানে আর অন্য কোন কথা নাই। অন্য কোন কিছু নাই। ঠাকুর কি করবেন, ঠাকুরের বিচার তোমরা করবে না। ঠাকুর যা বলবেন, তোমরা তাই করবে। তোমার মাকে যদি ৩০০ কোটি লোক বলে তোমার মা নয়, তুমি বিশ্বাস করবে? মা আমার মা, গর্ভধারিণী। মা রক্ষা করছেন, প্রতিপালন করছেন। মা যদি বলেন, তরে আমি পেটে ধরছি, তার ওপরে কোন কথা আছে? ৩০০ কোটি লোকের কথা তুমি অমান্য করলা, ফেলে দিলা। ৩০০ কোটি লোকের কথা বিশ্বাস করলা না। তুমিই মাকে জিজ্ঞাসা করলা, মা, আমাকে কি তুমি হাসপাতাল থিকা নিয়ে আসছো?

মা যদি বলে, 'না, তোকে আমি পেটে ধরেছি। এই তারিখে তুই হয়েছিস।' তার ওপরে কোন কথা আছে? ৩০০ কোটি লোকের কথা সেখানে কিছু না।

তাহলে গুরুবাক্য, গুরুর আদেশ, গুরু যা বলবেন, সেটাই মনে রাখবে, সেটাই পালন করবে। গুরুকে যদি কেউ চোর বলে, ডাকাত বলে, ভন্ড বলে, যা বলে বলুক, যে যা খুশী বলে বলুক, বাপ বাপই থাকে। ডাকাত বাপ হলে তাকে বাপ ডাকে না? চোর যদি বাপ হয়, তাকে বাপ ডাকে না? অফিসে তোমার সেই বাবার নাম বলবা না? না, আরেকজনের বাবার নাম বসাইবা? তবে? বাপ চিরকালই বাপ। কোন অবস্থায় বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। বিভ্রান্ত হয় কখন? যখন অপরাধগুলো ঘিরে ধরে।

বিবেকের মধ্যে যখন ঘা দেয়, বিবেককে যখন লাথি মেরে ফেলে দাও, তখন অপরাধীগুলো স্থান পায়। ওরা সবসময় ঘুরবে। এটাকে বলে Anty-force, বিপক্ষশক্তি, বিরুদ্ধশক্তি। সবসময় তোমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। জীবাণুগুলি যেমন থাকে, তাদের আক্রমণে infection হয়, এরকম তোমাদের infect করার জন্য বিরুদ্ধশক্তি সবসময় তোমাদের ঘিরে থাকবে, যাতে বাপ-বেটায় সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে। ওরা চাইবে যাতে বাপের ভাল দিকটা কেউ গ্রহণ করতে না পারে। বিরুদ্ধ শক্তির এই কাজ। ওরাও অপরাধী হয়েই জন্ম নিয়েছে। ওদের কাজই হচ্ছে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা, বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে তোলা। তোমাদের ভিতরে বিরুদ্ধশক্তি ঢুকিয়ে দেবে। আর বাপ চাইবে এর বিপরীত। এমন ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করবে, যাতে বিরুদ্ধশক্তি তোমাদের আক্রমণ করতে না পারে। তোমরা আক্রান্ত না হও। মনে রেখো, কথাগুলি যা বললাম। জীবনের পথে এই কথাগুলি সাথী করে রেখে দিও। পাথেয় করে রেখে দিও। জীবনে চলতে গেলে মৃত্যু যখন আছে, আর উপায় নাই। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

বিভ্রান্ত হয় কখন? যখন অপরাধগুলো ঘিরে ধরে।

বিবেকের মধ্যে যখন ঘা দেয়, বিবেককে যখন লাথি মেরে ফেলে দাও, তখন অপরাধীগুলো স্থান পায়। ওরা সবসময় ঘুরবে। এটাকে বলে Anty-force, বিপক্ষশক্তি, বিরুদ্ধশক্তি। সবসময় তোমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

"রাম নারায়ণ রাম"

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

		প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২ (শুভ উপনয়ন দিবস উপলক্ষ্যে)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা (কোলকাতা - ৭০০১১৫)
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা - ৭০০০৪৮
৩) রাম নারায়ণ রাম ভবন, মিত্র কুটির ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৪) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০